ভারতীয় সভ্য-তত্ত্ব

শ্রীমতিলাল রায়

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বার আনা]

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৯

মুদ্রাকর—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

দেশে আজ কাজের সাড়া পড়িয়াছে। অনেকেই বুঝিয়াছেন—দেশসেবার পুরাতন প্রণালী ছাড়িতে হইবে। নূতন ধারায় কর্ম্মসৃষ্টির একমাত্র উপায়—অন্তরকে জাগ্রত করিয়া তোলা। এই অন্তর-জাগরণের আভাস মাত্রে দেশে অসংখ্য দল গড়িয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র এই, সকলেই আত্ম-সাধনার অপেক্ষা দলের পুষ্টিসাধন ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার অনুকূল অবস্থা সৃজন করার দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছেন। ইহার ফলে, অন্তরের শ্রীবৃদ্ধি যত না হউক—দলাদলির মাত্রা বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর বুদ্ধি-ভেদ জন্মাইয়া দলপুষ্টির প্রচেষ্টায় বড় হইয়া আমরা আত্মসাধনার নামে সঙ্কীর্ণতা ও নীচতাকে প্রশ্রয় দিই, এখনও অবস্থা এমন গুরুতর হইয়া উঠে নাই; অতএব এই সকল ছোট কথার বিবরণে বক্তব্য দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। কাজের সত্য সঙ্কেতটী আমরা দেশের সম্মুখে ধরিব। ভিতরের সূত্রটা ধরিয়া উঠিতে পারিলে, অভেদ ভাবেই আমরা বাংলার সাধনক্ষেত্রে অবধারিত সিদ্ধি পাইব।

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবল স্রোতে পড়িয়া যাঁহারা ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে এখনও অনেক অগ্নিপরীক্ষা বাকী আছে—আত্মশুদ্ধির এই সুযোগে অনেকেই মানুষ হইয়া উঠিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা বলিতেছি—১৯০৫ সালের পীতবর্ণের উত্তরীয় মাথায় বাঁধিয়া যাঁরা মুক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন, তাঁদেরই কথা। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজিকার

যজ্ঞানুষ্ঠানে ঋত্বিকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিপুণ হস্ত নবজাগ্রত বাংলার শক্তিকে ফলপ্রসূ করিয়া তুলুক। আর আমরা যারা রাজনৈতিক জীবনের দূরে দাঁড়াইয়া নূতন ভঙ্গীতে দেশ-ব্রত-সাধনের সঙ্কল্প লইয়াছি, তাহাদের জীবন-বেদের দুই একটা কথা জাতীয় সাধনার এই ঘোরতর সমস্যা-যুগে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের মত অনেকেই হয়ত নূতনকে বুঝিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আমরা যখন কাজে নামিয়াছিলাম, অন্নচিন্তা তখন এতখানি গুরুতর হইয়া দেখা দেয় নাই। সারা দিনটা দেশের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতাম; কিন্তু যথাসময়ে বাপের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া দিন আমাদের চলিয়া যাইত। ধীরে ধীরে সংসারের ভার যে দিন কাঁধে আসিয়া চাপিয়া বসিল, সেই দিন বুঝিলাম—দেশের কাজ বড় সহজ নয়; একটী ক্ষুদ্র পরিবারের ভরণপোষণের ভারেই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গুঁড়ানাড়া হইয়া যায়, দেশসেবার আর সময় কোথা? মুখের দুটা কথা বলা ছাড়া দেশসেবার অন্য দান তখন জীবনে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাহারা দাঁড়াইতে পারিয়াছে, ভগবানের দয়া সত্যই সেখানে মূর্ত্তিমান্। তিনি দয়া করিলে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মূকও বাচাল হয়। আমরা তো তাঁহাকে চাহি নাই, তিনিই জোর করিয়া আমাদের চাহিয়াছিলেন, অতিথির বেশে ইচ্ছা করিয়া দ্বন্দ্বময় সংসারের বুকে আসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন; তাই তাঁকে স্বীকার করিয়া চলা ছাড়া আর আমাদের দ্বিতীয় গতি ছিল না।

তারপর, অতিষ্ঠ সংসার-ভারপীড়িত জীবনের উপর ভর করিয়াই বাংলার বিপ্লব-যুগ নামিতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থায়, নিজ কর্ম্মফলে আর রাজশক্তির অনুগ্রহে সর্ব্বনাশের চূড়ায় গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। পুরাতন পুড়িয়া ছাই হইল। সেই বিরাট্ ভস্ম-স্তূপের ভিতর হইতেই নবীনের কনককান্তি চক্ষু ঝলসিয়া ঝিকমিক করিয়া উঠিল। সেদিন এই নূতনের চরণমূলে বিকাইয়া যাইতে আর দ্বিধা রহিল না। সে ছিল আত্ম-সমর্পণের যুগ; সকলেরই জীবনে এ যুগ একদিন আসা চাই; কিন্তু সে কথা এখানে নয়।

নিজের বলিতে যাহা কিছু, বাংলার বিপ্লবযুগে একে একে তাহা শেষ হইয়াছে। এই নূতন করিয়া ঘর বাঁধার উদ্দেশ্য—জাতি ও ভগবানের জন্য ভিন্ন আর কি বলিব! কিন্তু এই জাতি-বোধ, এই ভাগবৎ অনুভূতি অহঙ্কারের শুদ্ধিবিধান করিল। গুণবৃদ্ধি হইয়া একজন দশজনে পরিণত হইল, দশজন শতজনে ছড়াইয়া পড়িল—এই সম্প্রসারণ কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হইবে, কে জানে? এই ব্যাপ্তির মূলে কর্ম্ম-লক্ষ্য নাই; আছে ভাগবত ইচ্ছা। মনকে এক করিয়াই আত্মবিস্তৃতি সফল হয় না, আত্মাকেই ছড়াইয়া চলিতে হয়; তাই ইহা তপঃ-সাধ্য।

যেখানে হিসাব করিয়া ঐক্যস্থাপন হইয়াছে, বড় বেদনায় সে মিলন-মন্দির ধরাশায়ী হইতে দেখিয়াছি। কাজকর্ম্মের বাটোয়ারা করিয়া মিলিবার যে পথ তাহাও রুদ্ধ হইয়াছে। আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দশজনের মধ্যে যে ঐক্যস্থাপন তাহার

ভিত্তিও তেমন দৃঢ় নয়। এই ঐক্যের প্রথম মন্ত্র—আত্ম-সমর্পণ। ইহার] সাফল্য—আত্মোপলব্ধিতে। এই অধ্যাত্মযোগেই আমরা নূতনকে জানিবার পাইবার বীজমন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি।

দেশকে এই জানার ও পাওয়ার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আপনাকে জানিয়া পাইয়া, অপরের সহিত একাত্ম হইতে হইবে। কোথাও পর আপন হইবে, কোথাও আপন পর হইয়া যাইবে। আমাদের জীবনে ঘটিয়াছেও তাই; এখনও উহাই ঘটিতেছে, ভবিষ্যতেও ইহার অন্যথা হইবে না। ভগবানকে চাহিলে, আর সকল চাওয়া রুদ্ধ করিতে হইবে। যে ভগবানকে চাহে না, সে জনক, জননী, জায়া যেই হউক, মনকে চক্ষু ঠারিয়া ইহার মধ্যে আর কোন সামঞ্জস্য নাই। দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া আমাদের অভেদাত্ম-সাধনের অন্তরায়-স্বরূপ এরূপ কত ঘটনা ঘটিয়াছে। যে আমায় চায়, তাহাকে আমি যাহা চাই তাহাই চাহিতে হইবে। সত্য ঐক্য-সাধনের সম্বন্ধ হইবে ভাগবত, কোন পারিবারিক বন্ধন ইহাতে টিকিবে না।

সাধনা কঠোর। হেলিয়া দুলিয়া, সকল দিক্ বজায় রাখিয়া ভগবান মিলে না, এ কথা কে না জানে! আঘাত পাইয়াছি খুব, পাইতেছি সাংঘাতিক; যদি অনন্তকে চাহিয়া থাকি, এ জ্বালা জুড়াইবে না। এই অন্তরাগুনের লেলিহান রসনার মুখেই আমাদের অনন্ত যুগ আহুতি দিয়া যাইতে হইবে। এই যজ্ঞাগ্নি আর যেন নির্ব্বাপিত না হয়। ইহার রক্তবর্ণ জিহ্বা আকাশ চুম্বন করুক, দক্ষিণা দেবীর স্তন্যপানে পুষ্ট হউক।

ভারতে এই তপঃশক্তির সাহায্যেই আমাদের সব কিছু গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই সাধন-পথের বিঘ্ন যে কেবল পারিবারিক বন্ধন তাহা নহে। স্বার্থের হাহাকারই যে জীবনে অশান্তি আনিয়া দেয় তাহাও নহে। আমাদের আছে অহঙ্কার; তার ছলনা অসাধারণ। বাহিরে যে শিক্ষা পাইতেছি, তাহাতে ইহার প্রভাবই বাড়িয়া যাইতেছে। ধন চাহিলে অকাতরে তাহা দিতে পারি, পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাও ক্লেশের কিছু নহে, প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা নাই; কিন্তু তোমার স্বরে স্বর মিলাইয়া চলিতে চলিতে যে দিন মনে পড়িয়া যায় আমার স্বাতন্ত্র্যের কথা, আমার বিভাজ্য ব্যক্তিত্বের গর্ব্ব, তখনই অন্তরে জ্বলিয়া উঠে বিদ্রোহের আগুন, দীর্ঘ দিনের সমবেত সৃষ্টির মাথায় পদাঘাত করিয়া, আত্মরক্ষার হেতু নিজেকে ছিনাইয়া সরিয়া দাঁড়াই! গতি কি আমার বন্ধ হয়? স্বভাব কি আমি ছাড়িয়া চলি? না! আবার আমায় মিলনের ক্ষেত্র খুঁজিতে হয়, আবার নূতন মানুষের গলা ধরিয়া পূর্ব্বের মত সেই একই সোহাগের রাগিণী আলাপ করি! হায়, প্রবঞ্চক মানুষ, চিরদিন প্রকৃতির বানর সাজিয়া দিন কাটিয়া যায়— একনিষ্ঠ তপস্যায়, আপনাকে নিঃশেষে ফুরাইয়া, একটি যুক্তাত্মার বিন্দু সৃজন করিয়া তুলিতে পারিলে যে বিশ্বনির্ম্মাণের শক্তিলাভ হয়—একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি!

আমাদের সকল কাজ—এই তপস্যার একটী নিখুঁত বিগ্রহ গড়িয়া তুলিবার জন্য। বাহির হইতে, কাজকেই ভাবের

অপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু ভাব যতই বৃহৎ হউক, সে লোক-চক্ষুর অগোচরে অন্তরেই প্রসারিত হইয়া উঠে। রেখায় রেখায় অসংখ্য রূপে এই ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইলে, বাহিরের বড় বাধা যে স্থান ও কাল, ইহাকে কুঁদিয়া কুঁদিয়া উহার স্থান করিতে হয়। কাজেই পৃথিবীতে এই যে কোলাহলের সৃষ্টি, সবই তো সেই ভিতরের অসীম ভাবের একটা ক্ষুদ্র কণা লইয়া। জাতি ভাব হারাইয়া, কাজের নেশায় ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়াছে; তাই এত কোলাহলের মধ্যে আমরা নির্ম্মাণের চিহ্ন তেমন বিশেষ কিছু দেখিতেছি না। বাঙ্গালী কি এই সত্য কথাটা তলাইয়া বুঝিবে না?

আজ আমরা যে মিলন চাই, যে ঐক্য চাই, উহা কোন মতে কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া যেন না হয়। আমার অন্তরের টান যে দিন তোমার অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করিবে, তোমার ও আমার মধ্যে যেদিন বিরহের বৃশ্চিক-দংশন অনুভূত হইবে, মিলনের তীব্র পিপাসায় উভয়েই যেদিন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিব, সেই দিন জানিও—জাতি-নির্ম্মাণের ঘূর্ণাবর্ত্তে তোমার টান ধরিয়াছে। বহু যে দিন একের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে, সেই দিন ভারতের সত্য কর্ম্ম আরম্ভ হইবে। এই কথা শুনিয়া অনেকেই মনে করিতে পারেন—ইহার জন্য আর করিবার আছে কি? ভগবানের ইচ্ছা হইলেই তো তাহা সফল হইবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে—আমরা কেবলই যন্ত্র নই, ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন মনো-প্রাণ-বুদ্ধির একটা সমষ্টীভূত চেতনা নই—আমরা জনে জনে ভগবান। সাধনারম্ভে

প্রকৃতির খেলা উপলব্ধি করিবার জন্য কিছু দিন নীরব উদাসীন (passive) থাকিতে হয়, জীবনের অধোমুখী আকর্ষণ তখন অতি পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতির স্বভাবগতি ভেদই সৃষ্টি করে, ভেদে শক্তিনাশ হয়, শক্তি-হীনের মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য সাধনার এই পর্য্যায় হইতে ধীরে ধীরে উচ্চগতি ও প্রেরণালাভের জন্য সাধককে ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করিয়া ধরিতে হয়। এই শক্তি—ভাগবতশক্তি। এই শক্তির সাহায্যেই আমরা নিজেকে জানিতে পারি, নিজের সত্য দিয়া অপরের অস্তিত্ব আপনার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। এই ভিতর দিয়া অন্যকে পাওয়ার গোপন রহস্য তখন সাধকের চক্ষে আর ধাঁধার সৃষ্টি করে না। সে অনুভূতি-লব্ধ অভিনব পন্থাই তখন জীবনের লক্ষ্য হইয়া উঠে।

পুরাতনের ভিত্তি উপড়াইয়া যে নূতন জাতি বাংলায় দিব্য নির্ম্মাণের তপস্যায় রত আছে, তাহাদের ধারণা—কেবল অন্নসংস্থানের উপযোগী শিক্ষা দিতে পারিলেই জাতি বাঁচিবে না। ভারতের মাটী তুষারাচ্ছন্ন নহে, অনুর্ব্বর নহে; আমরা মরিতেছি অনৈক্যে ভেদে, জাতিবোধের অভাবে। সর্ব্বাগ্রে এই ভেদ, এই অনৈক্য দূর করিয়া দিতে হইবে—বাহিরের দিক্ হইতে নয়, অন্তরের মিলন সত্য করিয়া তুলিতে হইবে; জাতিকে অখণ্ড দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া হাজার হাজার লোককে একাত্ম করিয়া তোলা একটী কল্পনা বা স্বপ্ন মাত্র ভাবিয়া কেবল উত্তেজনার সাহায্যে দেশের প্রাণশক্তিকে একত্র

করিতে চাহেন যাঁহারা, তাঁহারা আপাততঃ উহাতে কিছু কৃতকার্য্য হইলেও, ভবিষ্যতে উহার ফল ভাল হইবে না; কিন্তু এইরূপ অন্তর-গত মিলন লইয়া যদি সহস্র অসাধারণ মানুষের আবির্ভাব হয়, জগতে তাঁহারা যে কি পরিবর্ত্তন আনিতে পারেন তাহা আজ ভাবিয়া স্থির করাও সম্ভব নয়। আমরা বর্ত্তমান অন্দোলনের মূলে এইরূপ প্রেরণাই কিন্তু লক্ষ্য করিতেছি।

ভারতের নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা মিলিত হইবেন, তাঁহারা পরস্পরকে পৃথক্ করিয়া দেখিবেন না; কিন্তু ইহা একেবারে হওয়া সম্ভব নহে। একাত্ম অনুভূতি লইয়া কেহ জন্মগ্রহণ করে না। এতদ্ব্যতীত, বৈচিত্র্যই জগতের নীতি; আবার এই বৈচিত্র্যের মাঝে একাত্ম হওয়ার সাধনাই সংসার-গতি। স্বামীর সহিত স্ত্রী একাত্ম হইতে না পারিলে উভয়ের জীবনই বিষময় হইয়া উঠে। অখণ্ড সত্তার জ্ঞান হারাইয়া, আমাদের সংসার, সমাজ, শিক্ষা-সাধনা সবই ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। সৃষ্টির মূল কথা—জ্ঞান। জ্ঞানের প্রথম প্রতিজ্ঞা—এই অখণ্ডবোধের শিক্ষা। আমাদের কর্ম্মের মাঝে, আমাদের মিলনের মাঝে এই শিক্ষারই ফল্গুধারা প্রবহমান রাখিতে হইবে। ইহার অভাবে, অবস্থাচক্রে দুই দশ দিন আমরা মিলিতে পারি, কিন্তু সে মিলন স্থায়ী হইবে না। কোন কর্ম্ম বা সাধনা সমষ্টিবদ্ধ ভাবে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া চাই—যেন মিলনের পর আর আমরা ছাড়াছাড়ি না হই, উভয়ের অন্তরে আঘাত না লাগে।

এই ভেদ, এই আঘাত যদি কেবল সম্পর্কিত ব্যক্তিদের অন্তরে সাময়িকভাবে বেদনা সঞ্চার করিত, তাহা হইলে ইহার মধ্যে তেমন গুরুতর দোষের কথা ছিল না; কিন্তু এই ভেদের সুর, এই আঘাতের রেশ ও বেদনা ততদিন চলিবে, যতদিন না ইহার একটী চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশ হয়। ব্যাঘ্রের মত এই স্বভাব লাফাইতে লাফাইতে কত মানুষের অন্তর আক্রমণ করিবে, কত মহীয়সী প্রচেষ্টার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে! এ জগতে কোন কিছুই অনিত্য নয়; কোন ঘটনাই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার সামগ্রী নয়। গোঁজামিল দিয়া জীবনের কোন ছেদ পূর্ণ করা যায় না; প্রকৃতির কষ্টিপাথরে নিষ্ঠুর আত্মপরীক্ষায় সকলকেই উত্তীর্ণ হইতে হয়।

তাই কাজ গৌণ; মূল কথা—ঐক্য। অহঙ্কারকে গুঁড়া করিয়া দাও। অসংখ্য অহঙ্কারের রাসায়নিক শোধনে ও সংমিশ্রণে এক বিরাট্ ঐক্য-সঙ্ঘ নির্ম্মাণ কর। মিলনের পথে যদি আসিয়া দাঁড়াও, জানিয়া রাখ—আত্মপ্রকৃতির মধ্যে অনেক কিছু অনৈক্য রাখিয়াই আমরা সাধনা আরম্ভ করিয়াছি, আর এই অনৈক্যের মৌলিক কারণও যথেষ্ট আছে; তবে লক্ষ্য আমাদের এক হওয়া চাই। জাতিগত উত্থানের দিনে আমাদের মিলনই চাই। তাই প্রতিপদে হৃদয়ের সবখানি শক্তি দিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে—আমরা এক, আমরা অভেদ। বিঘ্ন অনেক; বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আমাদের জয়কে অধিকার করিতে হইবে।

পরাজয় মানিলে চলিবে না। স্বার্থপরতার কোন ছলনায় আমরা বিমুগ্ধ হইব না। হৃদয় রক্তাক্ত হইবে, নয়ন-জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইবে, পরস্পর পরস্পরকে পরম শত্রু জ্ঞান করিবে, তবুও তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমায় বলিতে হইবে—আমি তোমার, তুমি আমার; আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার, তোমার যথাসর্ব্বস্ব আমার। কখনও তুমি তিরস্কার করিবে, আমি পাষাণ বুক বিছাইয়া সহ্য করিব; আবার কখনও বা আমি হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে তীব্রবাক্যে তোমায় মর্ম্মাহত করিব, তুমিও তাহা হাসিমুখে বরণ করিয়া লইও। আমার সহস্র অপরাধ তোমার বলিয়া মার্জ্জনা করিতে হইবে, তোমার সহস্র ত্রুটি আমি হাসিমুখে আমারই বলিয়া গ্রহণ করিব। আমাদের কর্ম্ম হইবে এইরূপ সাধনার ক্ষেত্র-বিশেষ। ভাবের ঘরে ঐ সাধনা চলে না, তাই এই কর্ম্মক্ষেত্র নির্ম্মাণ করা। এইরূপ সাধনক্ষেত্র চারিদিকেই নির্ম্মিত হউক। যে ভীরু, যে লোভী, তাহার চিরদিন পতন হইবে; বীর্য্যবান্ পুরুষের জয় সর্ব্বত্র। অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র হউক, সর্ব্বত্র মিলনের এই মধুর আলাপ যেন আমরা শুনিতে পাই। ঐ সুরই সাধনার সুর, আনন্দের ঝঙ্কার, শক্তির রাগিণী।

এই কঠোর সাধনায় পাশ্চাত্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের গোলযোগ নাই। একটু গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই দেখা যায়, সমষ্টি আত্মার সহিত অবিচ্ছেদ প্রবাহ রাখিয়া স্বাতন্ত্র্যের বৈচিত্র্যের শুদ্ধ প্রকাশ ইহাতে বাধে না; বরং আপনাকে বৃহৎ করিয়া তোলার ইহাই অদ্বিতীয় উপায়। অহঙ্কার এই সত্যকে

আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। এই সত্যের প্রকাশে, বৈচিত্র্য রক্ষা পাইবেই; অধিকন্তু প্রতি আধারে অনন্তের খেলা চলিতে থাকিবে। তখন সত্য সত্যই আর কেহ কাহারও প্রতি ঈর্ষ্যা করিবে না। অনুভূতির বিভিন্ন স্তরে আছি বলিয়াই পরস্পরের মধ্যে এতখানি ভেদ দেখিয়া হতাশ হইতেছি। মূলতঃ যাহা সত্য তাহা লাভ করা সাধনসাপেক্ষ; কিন্তু অসম্ভব নহে।

বাহিরের মানুষ সংসারের ছোটখাট উদ্দেশ্য লইয়া আপনাকে দিন দিন ক্ষুদ্র করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্য লইয়া একত্র বহু ব্যক্তির সমাবেশ গোলযোগেরই সৃষ্টি করিবে। বৃহৎ ও সত্যের জন্য অল্প লোক লইয়া যদি সাধনা আরম্ভ হয়, তাহা হইলেও উপস্থিত দেশজোড়া কাজ মূর্ত্ত হইয়া না উঠিলেও, ভবিষ্যতে কিন্তু এই তপস্যাই জয়যুক্ত হইবে।

আত্মার মিলন যেখানে সার্থক হইয়াছে, সেইখানেই সঙ্ঘ। যাহা বলিয়াছি তাহাতে এইটুকু স্পষ্ট হইয়াছে কি না জানি না, যে সঙ্ঘ দুইটী প্রাণের অনাবিল নিত্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ জগতের বাধায় তো একেবারেই টুটিবে না, পরন্তু মরণেও ইহা শেষ হয় না। বাহ্য প্রমাণ না থাকিলেও, এ তত্ত্বটী আমাদের এমনই প্রত্যক্ষানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে তাহা লইয়া আর বিচারের আলোচনার প্রয়োজন হয় না। এই নিত্য সম্বন্ধ কেবলমাত্র স্বীকার বা অস্বীকার করিলেই যে স্থায়ী হইবে তাহা নহে। সে পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। ইহা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মনগড়া বস্তু নয়। আমাদের সঙ্ঘ অনিবার্য্য জীবন-তত্ত্বের ক্রমোন্মেষে স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত; ইহা মৌলিক স্বভাব, আমাদের স্বরূপ। দীক্ষিত সন্তানের

স্বরূপে সঙ্ঘ-সঙ্কল্প যদি ফুটিয়া না উঠে, যে সঙ্ঘের কথা আমরা প্রচার করি তাহা সিদ্ধ হয় না।

সঙ্ঘ-শব্দের ইংরাজী অনুবাদ করিতে গিয়া আমাদের বাধ্য হইয়া Commune শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। Commune যে অর্থে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, আমাদের সঙ্ঘ তাহার ধার দিয়াও যায় না। ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব পাশ্চাত্যের কমিউনিজম্ (Communism) নহে। শব্দ লইয়া মূল সামগ্রী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা গণ্ডগোলেরই সৃষ্টি করে।

বাংলায় সঙ্ঘ-শব্দের কিছুদিন যাবৎ খুবই প্রচলন শুনা যাইতেছে। সঙ্ঘগঠনের নানা আয়োজনেরও আমরা সংবাদ পাইতেছি। অনেকেই সঙ্ঘনির্ম্মাণের রীতি, নীতি, বিবরণী চাহিয়া পাঠান, তাঁহারা হয়ত মনে করিয়াছেন—সঙ্ঘ একটী সমিতিরই নামান্তর। অবশ্য এ সকলই যে খুব আশার কথা, তাহা বলাই বাহুল্য। সঙ্ঘ-সাধনার ভিতর দিয়াই দেশ নব জন্ম গ্রহণ করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের অটুট হইয়াছে।

সঙ্ঘ-তত্ত্ব লইয়া বিশদ ও বস্তুতন্ত্র আলোচনা করার দিন বোধ হয় এখনও আসে নাই; তবু এই অনুভূতির রেখাগুলি যদি সামান্য দিগ্‌দর্শনের কার্য্য করে, এই উদ্দেশ্য লইয়াই "ভারতীয় সঙ্ঘতত্ত্ব" প্রকাশ করিলাম।

—গ্রন্থকার

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং নো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবভাগং যথাপূর্ব্বং সংজানানাং উপাসতে ॥
সমানীব ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি ॥

ভারতীয় সঙ্ঘ-তন্ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠেই দেশাত্মবোধের সিদ্ধমন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল। তার পর অনেকেই জাতি-সাধনার সঙ্গীত আলাপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে মাত্র—জাতির প্রাণে উত্তেজনার সাড়া তুলিয়াছে, উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে, আত্মাকে দীক্ষা দিতে পারে নাই।

বঙ্কিমের মন্ত্র অমর। বঙ্কিম দেশযজ্ঞের আদি ঋষি। হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁর মন্ত্রধ্বনি একদিন এক সুরে ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া সমগ্র জাতিকে দীক্ষা দিয়াছিল। দেশসাধনার সে দীক্ষা ব্যর্থ হইবে না। মন্ত্রশক্তি অনিবার্য্য রূপে জাতির জীবনে নূতন সৃষ্টি সার্থক করিবে। সে সৃষ্টি—নবজাতির অভ্যুত্থান, যে জাতি ভারতের মুক্তিসাধনায় সিদ্ধি পাইবে।

ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবিপ্রতিভায় ঈশ্বরের বাণী য়া উঠিয়াছিল, দেশসাধকের মনস্কাম সিদ্ধ করিতে জীবন তুচ্ছ বোধ হইয়াছিল। সেই অতি বিস্তৃত অরণ্যে, গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া পল্লবের অনন্ত সমুদ্রে, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের ঘনান্ধকারে, সাধকের নিকট ভগবান দাবী করিয়াছিলেন—"ভক্তি।" বাংলার অন্ধ হৃদয় মথিত করিয়া সেই যে ভক্তির বান ডাকিয়াছে তাহা আজও রুদ্ধ হয় নাই, হইবে না। এই শুভ্র ফেনিল উচ্ছ্বাসিত প্রেমভক্তির ধারাপ্রবাহে বাঙ্গালীর হৃদয় শুদ্ধ পবিত্র হইবে, বিশুদ্ধ অন্তঃ-করণেই শক্তির বিদ্যুৎ বিচ্ছুরিত হইবে। কল্পনার পটে অমর কবির মোহন তুলিকাস্পর্শে সেই যে জ্যোৎস্নাধৌত প্রান্তর-মধ্যে সন্তানের কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিল—"বন্দেমাতরম্"—তাহার পর হইতেই বাঙ্গালী দেশকে মা বলিতে শিখিয়াছে, দেশের কাজে আত্মবলি দিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু জীবন দিয়াই দেশের মুক্তি আসে না; চাই ভক্তি—সে ভক্তি তপস্যার দ্বারাই অর্জ্জন করিতে হয়।

দক্ষিণেশ্বরে এই তপস্যাই আরম্ভ হইয়াছিল। ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের অমৃতশীতল কণ্ঠে ডাকার মত ডাকে পাষাণ হিয়ায় করুণার নির্ঝর ঝরিয়াছিল। সে ভাব-সাধনার চরম সৃষ্টি—বীরকেশরী বিবেকানন্দ। জড় প্রতীক-সাধনার অন্ত করিয়া ঠাকুর যেদিন অন্তরের মণিকোটায় অন্তর্য্যামীর সন্ধান পাইলেন, সেই দিন তিনি প্রতীক ছাড়িয়া চৈতন্যময় সত্তার কেন্দ্রসত্য-রূপে নরেন্দ্রনাথকে ধন্য করিলেন। নরেন্দ্রনাথের রুদ্ধ হৃদয়-দুয়ার

ঠাকুরের অপার কৃপায় খুলিয়া গেল ; যুক্তিতর্ক, বিচারবুদ্ধি বিশ্বাস-ভক্তির প্লাবনে ডুবিল, মথিত হইল—সরল শিশুর মত ত্যাগবৈরাগ্যপ্রদীপ্ত ঠাকুরের কোলে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন সে কি দিন ! সে মহামিলনের শুভস্মৃতি ঘনাইয়া ঘনাইয়া নিবিড় মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে চায়। আত্মায় আত্মায় এই যে অপূর্ব্ব মিশ্রণ-তত্ত্ব—ইহাই যে জাতি-গঠনের মূল ভিত্তি।

গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের তপস্যায় বাঙ্গালী আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। এমন অনাবিল প্রেমভক্তির মন্দাকিনী দুকূল উপ্‌ছাইয়া আর কোন্ দেশে ছুটিয়াছে ? নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণ-মাতান পাগল সুর ঘনীভূত হইয়া বিজয়কৃষ্ণের জীবনবীণায় যে মূর্চ্ছনা তুলিল, আজিও তাহা একান্তে বসিয়া কাণ পাতিলে শ্রুত হয়। মুমূর্ষু বাংলার জীবনতলে ফল্গুপ্রবাহের মত এই অবিচ্ছিন্ন ভক্তি-সাধনার স্রোতঃ বাঙ্গালীকে মরিতে দেয় নাই, অলক্ষ্যে নূতন জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছে। বাঙ্গালীর জাগরণ এই অতল তপস্যারই অভিব্যক্তি। তপঃশক্তি পশ্চাতে না থাকিলে, বাঙ্গালী মরিত, মজিত—বাঙ্গালীর অস্তিত্বচিহ্ন ধরাবক্ষে থাকিত না।

১৯০৫ সালে সিন্ধুরোলে সপ্তকোটী কণ্ঠ গর্জ্জিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরম্।" নিছক দেশপ্রীতি বুকে লইয়া বাঙ্গালী আগাইয়া দাঁড়াইল—স্বদেশযজ্ঞের পুরোহিত-রূপে। অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে তপোমূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া গেল। প্রাণের আহুতিতে যজ্ঞাগ্নি লেলিহান রসনা বিস্তার করিয়া গগন স্পর্শ করিল। সে আগুনে নিজেদেরই পুড়িয়া মরার কথা—কিন্তু তপস্যাকে অন্ধ

কর্ম্মী যতই আড়াল করিয়া দাঁড়াক, সে ভারতের সিদ্ধমূর্ত্তি। জাতিকে রক্ষা করিতে যিনি আবির্ভূত হইলেন, সেই তপোমূর্ত্তি আসমুদ্রহিমাচল কাঁপাইয়া কি করুণ মর্ম্মস্পর্শী স্বরে গাহিলেন —"আমি দেশকে মা বলিয়া জানি"—সে দিন আর একবার ধ্বনি উঠিল—"বন্দেমাতরম্।"

সেই শেষ। মন্ত্র বাঙ্গালীর শোণিতপ্রবাহে বিদ্যুদ্বর্ণে মিশিয়া গেল। শব্দমন্ত্র অতিবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালী তপস্যাকেই বরণ করিয়া লইল। এই তপোমূর্ত্তির মধ্যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র হইতে একে একে সকলেই সার্থক হইলেন। সে মহা-বিসর্জ্জনের বিজয়োৎসব এক যুগ ধরিয়া চলিল। আজ কেন উল্লাসের জয়বাদ্য বাজিয়া উঠে না? আজ কেন অবধারিত নির্দ্দেশ দিতে ফুৎকারে ফুৎকারে পাঞ্চজন্য তুমুল শব্দে সারা ভারত কাঁপাইয়া তুলে না?

বাকী আছে। উৎসর্গযজ্ঞের সিদ্ধ অগ্নি এখনও প্রসন্ন শিখায় তৃপ্তির, শান্তির নিদর্শন তো ফুটাইয়া তুলিল না! রুদ্র রসনা বিস্তার করিয়া হোতাকেই যে সে গ্রাস করিতে চায়। দিব কি? বাঙ্গালীর আছে কি? হে আমার দেবতা! যাহা আছে, সেইটুকু ছাড়িতে বড় সংশয় হয়, আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি!

আছে—দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। তুরীয় নয়, বস্তুতন্ত্র। জাতির সে মুক্তিপতাকা উল্লাসে গগন চুম্বন করিয়া কি উড়িবে না? উৎসবের পুলকে পথের ধুলায় কি আকাশ আচ্ছন্ন হইবে না? ভারত কি শুধুই

কামধেনু হইয়া রহিবে? ভারতের জাতি-সত্তার কি বৈশিষ্ট্য নাই? স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নাই? সংশয় বিষের বাতি বুকে জ্বালাইয়া দেয়। চাই শুধু সান্ত্বনা। অন্তরতম সত্তায় তপস্যার যে আঁচ স্পর্শ দেয়, ইহা জগদীশ্বরের ব্যাপক চাওয়া। ভারতের চাওয়া কি ব্যর্থ হইবে?

এ যুগে তাই কর্ম্মের চেয়ে তপস্যাই জীবনের গূঢ়তর মূলমন্ত্র। কর্ম্মের রূপ—তপস্যার প্রতিচ্ছবি। সে সাধনা নৈষ্কর্ম্ম্য নহে। পাপ—কর্ম্মাসক্তি। নিষ্কাম কর্ম্মে জীবন প্রসারিত হয়, আধার ঈশ্বরের সুমহতী ইচ্ছা ধারণ করার উপযোগী হইয়া উঠে। জাতিকে ঈশ্বরলাভের পথে আগাইতে অক্লান্ত কর্ম্ম করিতে হয়। প্রারব্ধক্ষয় না হইলে বিশুদ্ধ কর্ম্মপ্রকাশ হয় না; তাই এই দীর্ঘ যুগ কেবল মানব-সংস্কার ও অভ্যাসের নিরসন-কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। আমরা সকল কাজেই ব্যর্থ হইয়াছি; মানবের স্বপ্ন, উদ্দেশ্য সবই অপূর্ণ, কাজেই কিছুদূর গিয়া আমাদের ফিরিতে হইয়াছে—ইহাতে ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে না। অন্তহীন পথের যাত্রী সে সিদ্ধকর্ম্মী, তার সাধনা বাঙ্গালী আরম্ভ করিয়াছে।

বাঙ্গালীকে কাজ করিতে দাও—নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, জাতির জন্য। সে কাজের কোন বিশেষ ধারা থাকিলে জীবন স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, অর্থসঞ্চয়ক্ষেত্রে, সংস্কারক্ষয় অথবা ঈশ্বরপ্রেরণা, ইহার মূল যাহাই হউক—কাহারও ভাব-ভঙ্গ করিও না। নিঃস্বার্থ কর্ম্মে অন্তরের বাঁধন আল্‌গা হইবে।

ভাবের ঘরে চুরি যার, সে মরিবে। তবে ভাগবত জীবন লাভ করার আকাঙ্ক্ষা জাতিজীবনে যাহাতে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার জন্য একদল লোককে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ত্যাগবৈরাগ্যের আগুন জ্বালিয়া বসিতে হইবে। কামকলুষ পুড়াইয়া ছাই করার এই সব যজ্ঞকুণ্ডে ইচ্ছা করিলেই মানুষ যেন আত্মাহুতি দিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের জাতীয় সাধনার ইহাই হইবে সারস্বত কুঞ্জ, ভারতীর কলাগৃহ—জীবনশিল্পের সকল রহস্য প্রকাশ করার স্বাধীন ক্ষেত্ররূপেই যেন এই সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এখানে থাকিবে একটা ভাগবত বিধান, তাহা সকল সাধকের মধ্যে অখণ্ডানুভূতি। জাতিগঠনের ইহাই অনন্ত নীতি। সে নীতি পালন করিয়া সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়, সকল ভাবের ভাবুক স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া এক সুরে একই ভগবানের জয় দিবে, একাত্মক হইয়া ভারতের প্রাণশক্তিকে প্রবল করিবে, ধর্ম্মজীবনের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবে। এই শিক্ষা-দীক্ষা-সাধনার তীর্থক্ষেত্র মানুষের অহমিকা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যেন কলুষিত না হয়, শান্তি ও আলোর রাজ্যে যেন কেহ পাপকে লুকাইয়া না রাখে। আড়ম্বর বড় কথা নয়। সত্য, সুন্দর, দিব্য জীবনলাভের সরল আকাঙ্ক্ষা, মিলনের মধুরাগিণী, সাধুতা ও পবিত্রতার পুলক যদি দশজনের জীবনতন্ত্রে অনাহত সুরে বাজে, তাহা হইলে জানিও—সে পুণ্যমন্দিরের প্রতি ধূলিকণাস্পর্শে লক্ষ সাধক কৃতার্থ হইবে।

কিন্তু এমন তীর্থ একদিনে গড়ে না; সাধকের নিষ্কাম আত্মদানে তিল তিল করিয়া হৃদয়ের শোণিত ঢালিয়াই এ মন্দির গড়িতে হয়—সে মহাতীর্থগঠনের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত।

* *
*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমষ্টি-সাধনার গোড়ার কথা হইতেছে—নিজের সবখানিকে সমষ্টি-প্রতীকে আরোপ করিয়া চলা। যাহা কিছু সবই সমষ্টির জন্য, নিজের কিছু নয়। সমষ্টিই এখানে প্রতীক, সাধনা এক প্রকার প্রতীকেরই।

ভারতের সত্তা, বিশেষ বাঙ্গালীজাতি এই তত্ত্ব এত শীঘ্র বুঝে যে ইহা বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য খণ্ড না হইলে, আশ্রয় যাহা কিছু হউক না কেন, সাধনায় বিঘ্ন নাই। শক্ত—ধরা। মানুষ ব্যক্তিগত গণ্ডীর মধ্যে এমন ভাবে আবদ্ধ, যে প্রস্তর-মৃত্তিকা-রচিত যে কোন মূর্ত্তি, ঘট, পট, সবই আরাধ্য রূপে গ্রহণ করিতে পারে—ভাব, মন্ত্র, মানুষের চরণ শরণ করিতেও তার বাধে না—যদি পায় সে মুক্তি, সিদ্ধির আশ্বাস। কিন্তু যখনই তাহাকে গুঁড়াইয়া সমষ্টিগত সাফল্যের প্রতীক্ষায় তপস্যা করিতে হয়, তখনই জাগে সংশয়, ধৈর্য্যের বাঁধ খসিয়া পড়ে, ছিট্‌কাইয়া সে ব্যক্তিগত জীবন-বিকাশের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে, নির্ম্মম চাতুরীজাল বিস্তার করিয়া অনেক নির্ব্বোধ প্রাণীর জীবন শোষণ করিতে উদ্যত হয়। কি তন্ত্র, কি বৈষ্ণব, সহজিয়া, সকল সম্প্রদায়েই এরূপ ঘটনা বিরল নহে—সাধনার আশ্রয় স্বরূপ যাহা কিছু নির্দ্ধারিত হয় তাহার বিসর্জ্জন

অনিবার্য্য। প্রতিমার বিসর্জ্জন উৎসবের কোলাহলে ব্যথার অনুভূতি জাগায় না; কিন্তু মানুষকে আশ্রয় করিয়া যেখানে সাধনার সূচনা, সেখানে স্বরূপ-লাভের পর প্রতীক-বর্জ্জন সাধকের চক্ষে অকিঞ্চিৎকর হইলেও, রক্তে মাংসে গড়া মানুষের চক্ষে অশ্রু ঝরে, হাহাকার অন্তরীক্ষে দৌড়াদৌড়ি করিয়া ফিরে—কি জানি, মর্ত্ত্যের এই করুণ ক্রন্দন স্বর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায় কি না!

আবহমান্ কাল সাধনার ভঙ্গী এইরূপই হইয়া আসিতেছে। ব্যক্তিগত সাধনার প্রভাব এমন করিয়া জীবনের অস্থিমজ্জায় শিকড় গাড়িয়াছে, যে সমাজগত, সঙ্ঘগত বা জাতিগত সাধনার সঙ্কল্প থাকিলেও, নৈষ্ঠিক সাধনপদ্ধতিতে আপনাকে কেন্দ্র করিয়াই উহা আগাইতে থাকে; কাজেই স্বরূপের আস্বাদ পাওয়া মাত্র, সাধক কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হয়। ইহাতে অসংখ্য কেন্দ্র-রচনার সম্ভাবনা আছে; কিন্তু বিচ্ছিন্নতা যে সাধনার মূল নীতি, সে অনন্তকাল ছাড়িয়া ছাড়িয়াই চলিবে, কোন দিন গোষ্ঠীগঠন করিয়া পৃথিবীর বুকে জয়ধ্বজা উড়াইয়া জাতিকে সার্থক করিবে না।

অনেক সাধক ইহা চাহে না। উন্নত জীবনের স্তরে দাঁড়াইলে জাতি-বোধের ধূম্ররেখা অপসারিত হয়। জাতি, ধর্ম্ম, দেশ, এ সবই মনগড়া সামগ্রী, মনের রঙ্গীন কাচখানি যদি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, সব একাকার হইয়া যায়। যাঁহারা বিশ্ব-মানবতার ধূয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের অনুভূতি-স্তর কত উচ্চে উন্নীত হইয়াছে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এই স্তরে

ব্যক্তিগত ভাবে উঠিতে পারিলেই যে সমগ্র মানবজাতির মনের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া যাইবে, এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচিন নয়। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা মর্ত্ত্যের ধুলিধুসরাচ্ছন্ন ক্ষেত্র হইতে আপনাকে উর্দ্ধে উঠাইয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জীবের পরম কল্যাণের জন্য স্বেচ্ছায় সাধারণের মতই কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিয়া জাতির শ্রেয়ঃ বিধান করেন।

ভারতে একাধিকবার এরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে। অবতার-বাদের ভিত্তি এইরূপ চরিত্র-বিকাশের উপরেই ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু এই শ্রেয়োবিধানের পূর্ণ সত্য কোন দিন আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাগবত পুরুষদের বাণী অতীন্দ্রিয় জগতের সাড়া শুনাইয়া পরপারের আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে কাম-জর্জ্জরিত মনুষ্যজীবনে অমৃত-বিন্দু ঝরিয়াছে, মানুষ উন্মাদ হইয়াছে; কিন্তু ঐহিক জীবন-ধারার রূপান্তর সাধন করিয়া তাহা ইহ-জীবনেই সত্য দর্শন করে নাই, বরং নশ্বর বলিয়া ইহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। আত্মার নগ্নমূর্ত্তি স্বচ্ছন্দ, অনায়াসসিদ্ধ; কিন্তু কে আজ সবখানিকে সত্য করিয়া সৃষ্টির প্রতি ধুলি-কণায় স্বর্গ রচনা করিবে? এইরূপ দেবশিল্পীর ডাক আসিয়াছে। দুইজন হউক, দশজন হউক, একটা জাতি হউক—তপস্যার বিজয়মূর্ত্তি সেইখানেই ডঙ্কা মারিয়া জগদীশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিবে, যেখানে এই নশ্বর জীবনে ভোগের ভঙ্গীতে ভাগবত মাধুরী উছলিয়া উঠিবে, এই হাসিতে মধু ঝরিবে, এই দৃষ্টি অমৃত বর্ষণ করিবে; শুধু মধু আর মধু, মরণ নিত্য হউক—জীবনের আস্বাদ মধুময় হইলে, মরণেই

উল্লাস—কেন না, এই ফাঁকেই তো অনন্তজীবনের আভাষ সত্য স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়।

এই মানুষের যে থাক্, তাহারাই দেবগোষ্ঠী। যে দেশে এই দিব্য গোষ্ঠীগঠনের উদ্যোগ-পর্ব্ব চলিয়াছে, সে দেশে নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে। সৃষ্টির ক্রম আছে; আগে তাহারা নিজেদের গড়িবে, নিজেদের মধ্যে নিখুঁত সমাজ সৃষ্টি করিবে, নিজেদের দেশেই স্বাধীন রাজ্যের জয়-ধ্বজা উড়াইবে। তারপর আছে তাহাদের অনন্ত গতি, অনন্ত অভিযান। যদি কোন দেশে এমন পূর্ণাঙ্গ দিব্যজাতি গড়িয়া উঠে, সেই আদর্শে সারা পৃথিবী যে নূতন ভাবে গড়িয়া উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! কোলের কাছে আঁধার রাখিয়া দিকৃচক্রবালে সূর্য্যোজ্জ্বল ধরণী দেখিয়া দৌড়াইলে হোঁচট্ খাইবে—চলিতে হইবে ধীরে ধরণীবক্ষ দুলাইয়া, সারি দিয়া, তালে তালে; সে মন্থর নৃত্য অবিচলিত স্থির গতির লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে উত্তেজনা নাই, আছে আনন্দের নেশা; রক্তের ঢেউ তুফান তুলিয়া ইহাদেরও মধ্যে আছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু অভ্রান্ত দৃষ্টি আর অকম্পিত চরণ লইয়া ইহারা চলিয়াছে লক্ষ্যের পথে—বাধা কঠিন পদভরে চূর্ণ করিয়া। ইহাদের গতিরোধ করিবে কে? বিশ্বনিয়ন্তার নির্দ্দেশ চিরদিনই যে অলঙ্ঘ্য।

একটীর পর আর একটী অবস্থা যে সৃষ্ট হইবে, তাহা নহে। যুগপৎ গড়ার সঙ্গেই নূতন সমাজ, নূতন জাতি, নূতন শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনার ব্যবস্থা হইবে। বস্তুর ব্যাপকতার উপরেই বাহিরের ঐশ্বর্য্য ভূষণ জম্‌কাল হইয়া উঠিবে। ইহা বিপ্লব;

কিন্তু মহা-বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপেই সে বাধাকে ঠেলিয়া আত্মজয় ঘোষণা করিবে। এই পথে জাতি নিঃসংশয়। বিচার হার মানিয়াছে, দৃষ্টি ইহাদের নির্ভুল।

এই জাতি-সৃষ্টির অমর বীর্য্য বিধাতার আশীর্ব্বাদে ভারতের মাটীতে স্থান পাইয়াছে। সঙ্ঘ তার ভ্রূণ-মূর্ত্তি। চক্র-নেমি ক্রম-বিস্তৃত হইবে—কেন্দ্র-সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া নহে। নেমির প্রতি অংশ ঢালিবে তার জীবন-তপস্যা সবই এই চক্রপতিকে ; চক্রপতি সমষ্টিসাধনার ক্ষেত্রে অটলপ্রতিষ্ঠ হইয়া প্রতি রেখার পরিণতিকে ঠেলিয়া অনন্ত গতির পথে পরিচালিত করিবে। মহারাসের মহাপ্রতীকই নবজাতি। এই জাতি-সাধনার বিজয়দেবতা নিত্য পুরুষোত্তম। ইহার বিসর্জ্জন নাই। নিত্যলীলার মুক্তিতরঙ্গ বেড়িয়া বেড়িয়া সারা পৃথিবী গ্রাস করিবে। স্বর্গের নন্দাকিনীতে বান ডাকিলে অমৃতাভিষেকে মর্ত্ত্যবাসী ধন্য হইবে।

সত্যের অনুসন্ধান করিতে যে নেতি-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে, সে এই জাতি-চক্রের বহু দূরে পড়িবে। সত্য ভেদহীন, সত্য সৃষ্টির মূল বীজ, তুমি-আমি-সে সবই সত্যের মূর্ত্তি। সত্যের বিজয়-বিষাণ বাজিয়াছে, ভগবানের কণ্ঠে ভারতে জাতি-গঠনের সিদ্ধ মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে ; সে বাণী যাহার কর্ণে পরশ দিবে, সে সত্য-বিধৃত হইয়াই ভাগবত আদেশ প্রতিপালন করিবে।

ভারতে আজ এমন মানুষ জন্মিয়াছে, যাহাদের মর্ম্মে অগ্নিময় অক্ষরে ভাগবত ইচ্ছাই রূপ লইয়া ফুটিয়াছে। সত্যের নানা মূর্ত্তি

প্রকৃতি-ভেদে সাধনবৈচিত্র্য প্রকাশ করে। ভারতের জাতি-সাধনা অখণ্ড সত্যেরই একটা দিক্; সে দিক ধরিয়া ভারতের প্রাণশক্তি আশ্বাস পাইয়াছে, পথের সন্ধানও করিয়াছে—এই সিদ্ধ যাত্রা আর ব্যর্থ হইবে না।

* *
*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম যতদিন সমষ্টিগত না হয়, ততদিন জাতি ও সমাজের উন্নতি নাই। সমষ্টিগত ধর্ম্মের রূপই সঙ্ঘ। সঙ্ঘ বলিতে ইহাই বুঝায়, আর এই জন্যই সঙ্ঘ যুগ-ধর্ম্মী।

সঙ্ঘের ভিত্তি সৎ। ব্যষ্টি এই সত্যের সম্বন্ধে যখন আত্মদান করে, তখনই সঙ্ঘের উৎপত্তি। পৃথিবীতে যে কোন রূপ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠুক না কেন, তাহা চিরস্থায়ী নহে। পিতামাতার সম্বন্ধ, আত্মীয় স্বজনের সম্বন্ধ, পতিপত্নীর সম্বন্ধ, বন্ধুবান্ধবের সম্বন্ধ পরিবর্ত্তনশীল— আজ আছে, কাল নাই। কিন্তু সত্যের বন্ধন নিত্য চিরস্থায়ী, অতীতকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান্ ও ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালবিস্তৃত ; স্থতরাং ইহা অটুট। সঙ্ঘ এই অটল সম্বন্ধ-তত্ত্বের উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহা যথার্থতঃ স্থসিদ্ধ হয় না।

সঙ্ঘত্ব—অসংখ্য প্রবৃত্তির মধ্যে এমন একটী প্রবৃত্তি, যাহা অপর সবগুলিকে জয় করিয়া একটী ধর্ম্মকেই জীবনময় করিয়া তুলে। যে কোন যুগধর্ম্মের অভ্যুত্থানের মূল মর্ম্ম ইহাই। শ্রীচৈতন্যের প্রেমপ্রবৃত্তি—কত অসংখ্য প্রবৃত্তির উৎসর্গে তাহা এমন মূর্ত্ত প্রকট হইল, যাহা দিয়া তিনি আচণ্ডালের মুক্তির পথ প্রশস্ত করিলেন! জীবনে কোন একটী প্রবৃত্তি অন্য সকল

প্রবৃত্তিকে গ্রাস করিয়া বিস্তৃত প্রবাহ সৃষ্টি করিলেই একটা অসাধারণ শক্তির প্রকাশ হয়। অনন্ত জীবনপ্রবাহ একমুখী হইলে, ইহার খরস্রোতঃ যে প্রবল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। যে ব্যাভিচারী, তাহারও জীবনের উন্মাদনা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়; কোন সদ্-বৃত্তির জাগরণে একটা অসাধারণ প্রভাব-প্রকাশ খুবই স্বাভাবিক।

সৎ অসৎ উভয় প্রবৃত্তির কোন একটী যদি একমুখে ধাবিত হয়, তাহা প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করে। অসৎ সতেরই বিকৃতি; এইজন্য ইহার সম্যক্ স্ফুরণে বিকার দূর হয়, পরিণামে তাহা সতের আকার ধারণ করে। "ভক্তমাল" গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল, অজামিল প্রভৃতির চরিত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রবৃত্তির প্রকাশ গোড়া হইতেই একটা নবযুগের চিত্র ফুটাইয়া তুলে। বুদ্ধের ত্যাগ, শঙ্করের মায়াবাদ, রামানুজের ভক্তি-তত্ত্ব —ভারতের প্রত্যেক মহাপুরুষের জীবনে এইরূপ এক একটী বিশেষ ভঙ্গী এমন প্রবল হইয়াছে, যাহার মধ্যে জীবনের অপর সকল ভঙ্গী লয় পাইয়াছে। সে পরম প্রবৃত্তির গর্ভে বুদ্ধ অতুল রাজৈশ্বর্য্য, অনিন্দ্য পত্নীপ্রেম, পুত্রস্নেহ, সব বিসর্জ্জন দিলেন; জীবনের সেই বিশেষ ভঙ্গীটির জন্য শঙ্কর বিধবা মাতার স্নেহাঞ্চল পরিত্যাগ করিলেন, রামানুজ সুখের সংসার ছাড়িলেন। কাহার নাম করিব? এ যুগের রামমোহন হইতে কেশব, বিজয়কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র প্রভৃতি সকলকেই তো এই একই নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সাধনার অভিব্যক্তি যাহা তাহা তো এইরূপ একটী প্রবৃত্তির সংঘাতে অসংখ্য প্রবৃত্তির

জাগরণ, সংগ্রাম ও লয়—ইহা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সিদ্ধি এইরূপ একটী বিশেষ ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সফল প্রকাশ। যতদিন ইহা না হয়, ততদিন সাধককে অশেষ নির্য্যাতন দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহার জীবনের লক্ষ্য স্থির হয় না; নিজেও যেমন বিভ্রান্ত, তাহার কার্য্যকলাপে বাহিরের লোকও ততোধিক বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। বাহিরটা নিজের অন্তরেরই ছবি; অন্তর স্থির হইলে, বাহিরেও সামঞ্জস্য দেখা যায়।

সেইজন্য সঙ্ঘ-সাধককে দেখিতে হইবে—সঙ্ঘপ্রবৃত্তির জন্য আমাদের অন্যান্য প্রবৃত্তি নিঃশেষ হইয়াছে কি না। বাহিরের দিক্ দিয়া সৎ যাহা, তাহার আচরণকে বিলোম গতি বলে; তাহার ফল সাময়িক, স্থায়ী নহে। অন্তর-সত্তার বিশেষ রূপটীর প্রকাশেচ্ছা ভিতর হইতে যখন জাগিতে আরম্ভ করে, তখন বাহিরে যে আচার অনুষ্ঠান প্রকাশ পায় তাহাই অনুলোম। যেমন জোয়ারের সময়ে নদীর জলকে বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার প্রয়াস বিলোম; আর ভাঁটার সময়ে ইহা অনুলোম। আমি যাহা তাহা ভিতর হইতে ধীরে ধীরে যখন ফুটে, তখন ইহাকে অনুলোম প্রকাশ বলে। আমি যাহা করিতে চাহি, বাহিরের চেষ্টায় তাহা সিদ্ধ করিয়া তোলার আকাঙ্ক্ষা বিলোম। ইহা একবারেই নিরর্থক নয়; তবে যাহা চাহি তাহা না পাইয়া ভূয়োদর্শনই বাড়ে, জীবনসাধনায় ইহারও মূল্য নিতান্ত কম নয়।

সঙ্ঘ যদি আমার জীবনের মূল মন্ত্র হয়, তবে ইহার জন্য সব বলি দিতে হইবে। বুদ্ধির মার আছে। মনে হইবে—

ইহার দ্বারা পূর্ণজীবনের আস্বাদ পাইব কি না! পূর্ণজীবনটী নির্ভর করে না—তোমার এই ক্ষুদ্র অহং-এর খণ্ড অনুভূতির উপর। অনন্ত ভাগবত তত্ত্বকে মানুষী তনুর আশ্রয়ে সন্দর্শন করা যেমন বুদ্ধিমানের পক্ষে বামনের চন্দ্রধারণের মত অসম্ভব, সেইরূপ স্বরূপপ্রকাশের লক্ষণ স্বরূপ একটী বিশেষ প্রবৃত্তির জাগরণে পূর্ণযোগের আস্বাদ বুদ্ধির মাপকাঠিতে কুলাইবে না। কিন্তু অনন্ত ভগবানের পক্ষে সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত মানবদেহে আত্মপ্রকাশ যেমন অসম্ভব নহে, তদ্রূপ কোন একটী প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া পূর্ণযোগের যে আস্বাদ তাহার অনুভূতি বড় সহজ নীতি—মর্ম্মী না হইলে, একথা বুঝিবে কে!

লোকের কাছে যাহা খণ্ড ও অসম্পূর্ণ, সিদ্ধ হয় ত তাহাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি খুঁজিয়া পাইয়াছে। তাই তো যুগে যুগে নব নব ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। অব্যক্তের সবখানি কোন দিন ব্যক্ত হয় না; উহা যে অশেষ। কিন্তু অব্যক্তকে ব্যক্ত করার প্রেরণায় পূর্ণযোগী উন্মাদ, অনন্ত জীবন সম্মুখে রাখিয়া গ্রন্থীর পর গ্রন্থী উন্মোচন করাই তাহার কাজ। এইরূপ পূর্ণযোগীর থাক্ যাহারা, তাহারা যুগপ্রবর্ত্তক। যখন প্রেমের গ্রন্থী খুলিতে হইবে, তখন তাহারাই শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের জীবন লইয়া অবতীর্ণ হয়; আবার যুগপ্রয়োজন-ভেদে তাহারাই ত্যাগে বুদ্ধ, মায়াবাদে শঙ্কর, ধর্ম্মসমন্বয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ। যাহা অতীত তাহা ইতিহাস. অনাগতকে টান দিয়া লইয়া আসাই যুগপ্রবর্ত্তকের কাজ। যুগধর্ম্মী নূতনকে আহ্বান দেয়। যেখানে ব্যষ্টি সমষ্টি-পুরুষে আত্মদান করিয়া আপনাকে ফুরাইয়াছে, সেইখানেই সঙ্ঘ। ইহা

আমার তোমার বস্তু নয়, ইহা ঈশ্বরের দান ; বুঝি তা'ও নয়—স্বয়ং ঈশ্বর। সঙ্ঘ-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ যে, নবযুগ প্রবর্ত্তনে তার সর্ব্বস্ব পূজার বেদীতলে বলি পড়ে ; সব দিক্ রাখার মানুষ প্রবৃত্তির দুলাল, জন্মমৃত্যুর নাগরদোলায় দুলিতে দুলিতে আহার-নিদ্রা-মৈথুনের খেলায় মাতিয়া থাকে। সঙ্ঘ-ধর্ম্মী একটি মহাপ্রবৃত্তিকে পুষ্ট করিয়াই দিব্যপ্রবৃত্তিময় হয়, মন্ত্র সিদ্ধ করার জন্য তার একটী নিঃশ্বাসেরও বৃথা ব্যয় হয় না।

সঙ্ঘের সাধনা—সত্য, সম্বন্ধ, সংযম। সহজভাবে এই ত্রি-ধর্ম্ম প্রত্যেক সঙ্ঘ-সাধকের জীবনে স্বতঃই আত্ম-প্রকাশ করে। আচরণের উপর ইহা নির্ভর করে না। ধর্ম্মের মূর্ত্তিই আচার-রূপে সিদ্ধ হয়। সাধকের ধ্যান—ভিতরের আকর্ষণ। আসন—অন্তরের শুদ্ধতা। প্রত্যাহার—মন্ত্রে নিষ্ঠা। সমাধি—সাধন-প্রবৃত্তিতে সর্ব্বস্ব-লয়। সত্যঘন ইষ্টমূর্ত্তি এই লয়ের পরই ফুটিয়া উঠে।

ইষ্টের সম্বন্ধ-রস—নব সৃষ্টির ইহাই একমাত্র উপাদান। সম্বন্ধের রসায়ণেই জীবন মধুময় হয়। প্রবৃত্তির সহস্রমুখী টান এক টান করিয়া যে উৎসর্গ-সূত্রে চির সম্বন্ধ পাইয়া আর সকল সম্বন্ধের তর্পণ করিয়াছে, তার জীবনগতি নিরবচ্ছিন্ন সঙ্ঘ-তত্ত্বেরই অনুগামী, সর্ব্বেন্দ্রিয় নিরলস সাধনসমরে উদ্যত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাহার লক্ষ্য দিবার অবকাশ নাই, তত্ত্বের রসে আঁখিপাতা ঢুলিয়া পড়ে, কাণে বাজে সঙ্ঘ-তত্ত্বের বিজয়-বিষাণ, কারও কথা শুনিবার উপায় থাকে না। নিরুপায় না হইলে, বুঝি এক-রসে জীবনবৃত্তি মজে না।

স্বরূপের আকর্ষণেই মানুষ নিরুপায় নিরালম্ব হয়, সঙ্ঘ-সাধনে প্রবৃত্তি জাগে।

এই প্রবৃত্তি দিয়াই দেশ, জাতি নূতন ছন্দে গড়িবে। এই প্রবৃত্তি দিয়াই সঙ্ঘের অমর বীর্য্য প্রকাশ পাইবে। সম্বন্ধ-তত্ত্বে অবগাহিত হইবার সঙ্কল্প মাত্রে নিজের প্রবৃত্তিই যেমন বিরুদ্ধ হইয়া উঠে, তদ্রূপ কল্পনার আকাশ উদ্ভিন্ন করিয়া উহা যখন বাস্তবে অবতরণ করিবে, বস্তুজগৎ তোমার বিরুদ্ধ হইবে। সঙ্ঘ-স্বরূপের যদি তুমি অবিভাজ্য মূর্ত্তি হও, তোমার ভয় নাই; কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না, যে হেতু ইহা ভাগবত বিধান। বস্তুজগতের বিঘ্নবিপত্তির আবর্ত্ত অতিক্রম করিলেও, তোমার সিদ্ধি সম্পূর্ণ হইল না; যে তত্ত্বের জন্য তুমি কুলত্যাগী উন্মাদ, জগতে তোমার ঠাঁই নাই, সেই তত্ত্বেরই বিরুদ্ধতা তুমি অনুভব করিবে। এ অনুভূতি নিদারুণ, অতিশয় বেদনাময়। কিন্তু ইহা তোমার দ্বৈত-বোধেরই অপরিহার্য্য লক্ষণ। সতের সহিত সতেরই সম্বন্ধ হয়, প্রভুর সহিত ভৃত্যের মিলন হয় কি? তত্ত্বের বিরুদ্ধতা তোমায় কষিয়া সতের বরণে পরিণত করিতে—তার পর, মিশ্রণ-তত্ত্বের মধুময় আস্বাদে তুমি অমর হইবে।

বলিয়াছি, সঙ্ঘ একটা তত্ত্ব; ইহাই বিশেষ যুগধর্ম্ম। সঙ্ঘের সিদ্ধিতে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি পর্য্যন্ত যদি সঙ্ঘ-তত্ত্বের প্রতিকূল বলিয়াই প্রতীত হয়, উহা আত্মসাধনারই ত্রুটি; যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানে যত বিলম্ব করিবে, তত আঘাত পাইবে। জগতের সব রূপই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, সুতরাং আঘাত বলিয়া যাহা

অনুভব কর, উহা শ্রীভগবানের স্পর্শ। যখন প্রহার মনে হয়, তখন মিলনের মাধুর্য্যে সব গলিয়া এক হয় নাই, তুমি ভাগবত স্বরূপ হও নাই। সঙ্ঘ শ্রীভগবানেরই সিদ্ধ কল্প-মূর্ত্তি। ভবিষ্য জগৎ এই শ্রীমূর্ত্তিরই নিখুঁত প্রকাশ। যুগ-ধর্ম্ম সাধনে এই স্বরূপের কল্প-রূপই দিব্য নীতি ধরিয়া প্রকট হইবে।

* *

*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সঙ্ঘ-সাধনার বিশেষ ধর্ম্ম—সংযম। সঙ্ঘের পুরুষ নারী নূতন জাতির অগ্রদূত। তাহাদের জীবন হইবে ভাগবত; আধার হইবে ভাগবত বীর্য্যময়। নিষ্কলুষ কামশক্তি দিব্য সৃষ্টি ও গঠনের জন্যই উন্মাদ হইবে। এই নূতন জীবনের জন্য চাই—অটুট সংযম। ইহার বিধান সর্ব্বেন্দ্রিয়, মনোবুদ্ধি, ইষ্ট-যুক্তির বিধি অনুসরণ করার দায়েই সিদ্ধ হইবে। জীবনের একমুখী টান দোরস্ত না হইলে সঙ্ঘ-সাধনা কখনই সার্থক হয় না। দুটী প্রাণ এক করার তপস্যায় পরিপূর্ণ আত্মদান সংযম-রক্ষার উত্তম ও অমোঘ উপায়।

সংযমের দুইটী তত্ত্ব—বীর্য্য ও উৎসর্গ। কার্য্য করে না মানুষের দেহ, কার্য্য করে বীর্য্য। বীর্য্যের শোধন ও ধারণ, তাই জীবনের বড় কথা। দেহ ধারণ করে বীর্য্যকে; বীর্য্য যেখানে বিশুদ্ধ, দেহও সেখানে সুস্থ ও অমৃতময়। আবার যাহার জীবন উৎসর্গীকৃত নহে, সে খাঁটি বীর্য্যের সন্ধান পায় নাই, ধৃত বীর্য্যের অমরত্বদায়িনী শক্তি ও আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। বীর্য্যহীন জীবন নপুংসকের মত অশুচি ও অশুভকর। নপুংসক যেমন আকারে মনুষ্য, কিন্তু মানুষের মহত্তর বিশেষ গুণ হইতে বঞ্চিত; তদ্রূপ বীর্য্যের অভাবে, মানুষ যুগের সঙ্কেত

বুঝে, পড়া পাখীর মত আবৃত্তিও করে সত্য বুলি, কিন্তু কিছুকে কাজে পরিণত করিতে পারে না। নাই যে উৎসর্গ, তাই তরল-বীর্য্য, অশুদ্ধ জীবনযাত্রার দারুণ মর্ম্মবেদনা তাহাতে গুমরিয়া মরে। এই জন্যই যে আজ সারা জাতিটা পঙ্গু, ম্লান ও এক প্রকার জীবন্মৃত।

বীর্য্য হইতেছে নিরতিশয় সামর্থ্য। কর্ম্মে অবসাদ সামর্থ্যের অভাবেই ঘটে। বীর্য্যস্খলনেই সামর্থ্যহীনতা উপস্থিত হয়। স্খলন—পতনের কারণ। যাহা অটল নহে তাহা চলকিয়া পড়ে—পড়িবেই, তাহাকে স্থির রাখা সম্ভব হইবে না।

ইহাকে অটল স্থির রাখার উপায় কি? সংযম এই অটুট বীর্য্যেরই স্থির লক্ষণ। বীর্য্য স্থির না হইলে সংযম কল্পনা মাত্র।

বীর্য্য-পাত হয়—তার কারণ, পিতামাতার কাম-সংস্কার স্বভাবতঃই রক্তে মাংসে সংলগ্ন থাকে। যৌবন-বিকাশে অন্যান্য বৃত্তির সহিত কাম-বৃত্তিও অঙ্কুরিত হয়। উহা ব্যাধি নহে; পরন্তু উহা স্বভাবের উপাদেয় গুণ। কামই জীবনের ধর্ম্ম। কাম-বীজেই জীবের জন্ম। এই কামনার উচ্ছেদ করিতে গিয়া, ভারতে ঢাকি-শুদ্ধ বিসর্জ্জন যাইতে বসিয়াছে; তাই কথাটা তলাইয়া বুঝা দরকার। কামনা যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে, অপরিসীম কার্য্যসিদ্ধির সহায়; ইহাই ব্রহ্মনিরূপণের কারণ হয়। আবার যৌবনসুলভ চাপল্যের কষাঘাতে, এই কামবৃত্তির অনুশীলন অধোবৃত্তি-রূপেই সংসিদ্ধ হয়—ইহার পরিণাম ক্ষয় ও অপচয়। যদি সত্য বলিয়া যাহা স্বীকৃত তাহার দিকেই ইহাকে উদ্যত করায় কুণ্ঠা না থাকে, তবে আর বীর্য্যক্ষয় না হইয়া

অবধারিত ইহার দ্বারাই যাহা দুঃসাধ্য তাহা সুসাধ্য হইবে, যাহা কল্পনার অতীত তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে।

কাম-চাঞ্চল্য—বীর্য্য-রূপ চরম ধাতুকে বিকৃত করে। এই চাঞ্চল্য যদি দূর হয়, ধাতুও স্থির হয়। চাঞ্চল্যে বস্তু বিকৃত হয়, মন্থনেই তো বিকার। অমথিত স্থিরত্ব আসে কিসে? নিষ্ঠায়, প্রেমে। এইখানেই উৎসর্গের কথা। কৃচ্ছ্রতায়, তপস্যায় যে বীর্য্যরক্ষার প্রথা তাহা সাময়িক। জীবন চির-তপস্যায়, চির-কৃচ্ছ্রতায় শুকাইয়া রাখা যায় না। জীবন কেবল ইহার জন্যই নহে, ইহা ভোগের ক্ষেত্রও বটে। তাই তপস্যার অন্তে আবার পূর্ব্ব সংস্কার প্রবল মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত যার জীবন, কাম তার ঊর্দ্ধমুখী হওয়ায়, ইহাই স্বভাবে পরিণত হয়। ইহার ফল তাই স্থায়ী সংযম-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দীক্ষায় বীর্য্য স্থির হয়। বীর্য্য স্থির হইলে, কামচাঞ্চল্য দূর হয়। কাম যে মহাশক্তি। কামের তাড়নায় মানুষ উন্মাদ হয়, কাম শরীর মনকে নৃত্য করায়। কামই জীবনের বিদ্যুৎ-স্ফুর্ত্তি।

তাই কাম-বীজের উপাসনা করিতে হয়। কাম-চাঞ্চল্য স্থির করিবার জন্যই ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণের বিধি। আত্মসমর্পণ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়াই অবিকৃত কামের যে শুদ্ধ মূর্ত্তি—বীর্য্য, তাহাই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মসমর্পণের দীক্ষা লইয়া যে স্বপ্নেও কাম-বীজকে বিচলিত করে, তাহার মুক্তি নাই; সে দীক্ষার মন্ত্রকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে নাই, সে আত্মপ্রবঞ্চিত হইয়াছে।

বীর্য্য অটুট বলিয়া উৎসর্গমন্ত্রের সাধক কর্ম্মে অক্লান্ত। এই কর্ম্ম তাহার যোগযুক্তি। কেননা, আত্মকামনার সংঘাত তাহাকে নাচায় না, ভাগবত প্রেরণা তাহাকে উদ্বুদ্ধ করে; ভগবানের চাওয়া তাহার অন্তরে অনাহত বংশীধ্বনি করে। অখণ্ড কামশক্তি ব্রহ্মবীর্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করে কর্ম্মে; তাই তাহার সৃজনে দিব্যসৃষ্টিই ফুটিয়া উঠে। আধারের বিকৃতি কর্ম্মস্রোতেই বিদূরিত হয়।

আমরা সাধনাকে মূর্ত্ত করিতে ভয় খাই—ক্ষুদ্র বলিয়া। কামনার সংঘাতে জলবুদ্বুদের মত যে অহমিকা, এইটুকুই হইয়াছে আমাদের অস্তিত্ব। প্রতি পদেই পাছে ইহা বিচূর্ণ হইয়া পড়ে, তাই এত সতর্কতা। ক্ষুদ্র জীবনের সংস্কার দৃঢ় হইয়া মূলকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। উৎসর্গ-যজ্ঞের পূজার মন্ত্র শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠি। তনু, প্রাণ, ধন, লজ্জা, কর্ম্ম, জ্ঞান, সব দিয়াই যে কাঙাল হইতে হয়—কারণ এইগুলিই যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে আমাদের আসল রূপকে, স্বরূপকে। ভগবানে উৎসর্গীকৃত-জীবন না হইলে, প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করার যে দুর্জ্জয় বীর্য্য তাহা আবিষ্কৃত হয় না। এই আত্মত্যাগের অভাবেই এই বিরাট্ জাতিটা সব জানিয়া শুনিয়াও বোকা সাজিয়াছে। জাগিয়া ঘুমাইলে, আমাদের মুক্তির বাণী চিরদিনই তো স্বপ্ন হইয়া থাকিবে। দোষ অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া আক্ষেপ করিলে কি হইবে, আমরা স্বখাত সলিলেই ডুবিয়া মরি।

যুগের সঙ্কেত কি, তাহা বুঝে না কে? কিন্তু তাহার জন্য আত্মদান করিতে পারে কয় জন? শরীর-ধর্ম্ম, প্রাণের ধর্ম্ম,

গুণগত বর্ণগত সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবার মত অধিকারীর সংখ্যা হয় ত অঙ্গুলীর পর্ব্বে গণিয়া শেষ করা যায়—কিন্তু ইহাই যে যথেষ্ট; অগণিত সংখ্যায় কার্য্যসিদ্ধি কোথায় হইয়াছে? বিদ্যুদ্বীর্য্যই দেশকে ধন্য করে। সে বীর্য্যের অধিকারী দুই দশজনের মিলিত শক্তির আবির্ভাবেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধির আশা দুরাশা নহে।

হয় ত উৎসর্গীকৃত প্রাণের সন্ধান মিলে, কিন্তু মিলনের পুণ্যতীর্থ কোথাও যে গড়ে না! প্রেমের রসায়ণে সবখানি দ্রব না হইলে, মিশ্রণের অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য কেমন করিয়া প্রকাশ পাইবে? আজ তো আত্মসাধনার আহ্বান বাজে না, উহা যে আপনার ভারে আপনিই পিছাইয়া পড়ে—হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ভগবানের পাঞ্চজন্য ফুকারিয়া উঠে মিলনের আহ্বানে। প্রেম ও ঐক্যের সাধনায় কে ডুবাইবে আপনার ত্রিকাল ও ধর্ম্মকে! কোথায় এমন প্রাণ-মজান করুণ বংশী গুমরিয়া মরে রে! প্রাণের তারে মূর্চ্ছনার স্পন্দনে অধীর আকুল আমরা কোন পথে অভিসার করিব? পথের সন্ধান কে দিবে?

ঘরকে পর কর, কূল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিয়া পড়, তবেই কাণ্ডারী পারের তরীকে উঠাইয়া লইবেন। আজ এমন প্রেমের কাঙাল, সর্ব্বহারা তরুণ প্রাণ আছে কি—মিলনের ডাকে সাড়া দিবে?

তার পর? তার পর, নবজাতি-গঠনের যে সঙ্কেত জীবন-তন্ত্রে নিত্য ঝঙ্কার দেয়, তিল তিল আত্মদানে তাহাই গড়িয়া

তোল। জাতির মধ্যেই নবজাতির সৃষ্টি চাই। মিশ্রণের অমোঘ শক্তি বিচ্ছিন্নপ্রাণ পুরাতনকে আপনার মধ্যে অনায়াসে সংহরণ করিয়া লইবে। পুরাতন আত্মরক্ষার দায়েই এই নূতনের হাতে আত্মসমর্পণ করিবে। বাহিরের দুর্য্যোগে আত্মনাশের আশঙ্কা বড় প্রবল; আত্মযোগে মিলনের মধুস্রোতঃ যদি বহাইতে পার, জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে বসন্তের সঞ্চার হইবে—দেশ ধন্য হইবে, জাতি ধন্য হইবে, তুমি আমি প্রতি ব্যষ্টিই সেদিন জীবনের জয় দিব।

কিন্তু আজ চাই বিসর্জ্জন। জাতি থাকিবে না, বর্ণ থাকিবে না; সমাজ, ধর্ম্ম, চেতনার স্তরে যত সৃষ্টি, সবই মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বিসর্জ্জনের বাদ্যে প্রাণ যার নাচে, সে কি পিছাইবে? বিসর্জ্জন—একেবারে বিসর্জ্জন, কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া নহে। কে আছ, জাতি, ধর্ম্ম ভুলিয়া, পিতৃপিতামহের মর্য্যাদা মহিমা ডুবাইয়া, বংশগৌরব, আভিজাত্য, সব নিঃশেষে মুছিয়া, এই চলমান শ্মশান, কঙ্কালময়, ক্লিষ্ট, মুমূর্ষু জাতির পশ্চাতে এই অভিনব জাতীয়তার নব বেদী রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ—যাহাদের ধর্ম্মে থাকিবে না এক তিল বৈষম্য, কর্ম্মে থাকিবে না এক তিল পার্থক্য, অর্থে থাকিবে না কণামাত্র আসক্তি—এই অভেদ, একাত্ম শরীরভেদের বৈচিত্র্য মাত্র লইয়া অনাগত মহান্ সত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া ভারতের জয় দিবে! সব কিছুর বিসর্জ্জনের পর, যদি প্রতিষ্ঠা পায় ভারতের অতীত, ভারতের সনাতন, দ্বিধা থাকিবে না এই অমর সত্তার আশ্রয়ে নির্ভয়ে দাঁড়াইতে; আর যদি সব ডুবিয়া জীবনে জাগিয়া উঠে এমন কিছু অভিনব—

যাহা প্রাচীনের সহিত সকল সম্বন্ধবর্জ্জিত বস্তু—তাহাই হইবে ভবিষ্য ভারতের সত্য রূপ। অবিনাশী যাহা তাহাকে আজ এমনই নির্ম্মম অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া পুনর্গ্রহণের দিন আসিয়াছে। বিশ্বাস শুধু মুখের কথা যার, সেই আত্মবিসর্জ্জনে পিছাইবে; কিন্তু উদীয়মান জাতির অগ্রদূত যাহারা, নবযুগ-স্থাপনের যজ্ঞপুরোহিত তরুণের দল, আজ আত্মসমর্পণের চরম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমরা কি বিশুদ্ধ বীর্য্যের অগ্নিমূর্ত্তি হইতে ভয় পাইবে? মরণ যদি সত্য হয়, তবে আইস, মৃত্যুর কোলেই লয় পাই; কিন্তু জীবনের মন্ত্রেই যে আমাদের দীক্ষা। অমর ভারত স্বপ্ন মাত্র নয়, তাহাকে সত্যে পরিণত করিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণসমষ্টির ডাক আসিয়াছে—সে ডাকে সাড়া দাও—ভারতে নবজাতি গড়িয়া উঠুক। সংখ্যার উপর লক্ষ্য দিও না, আপনার উপর অটল নির্ভরতা রাখ। এইরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠ দুইটী প্রাণের অমর সংমিশ্রণই ভবিষ্য মুক্ত জাতির বীজাঙ্কুর—একদিন ইহা হইতে বিশাল ভারতজাতি গড়িয়া উঠিবে। ধর্ম্ম-বর্ণ-জাতি-নির্ব্বিশেষে পাগল কে আছ—সাড়া দাও।

* *

*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মসমর্পণযোগ—ইহার উপর ভিত্তি করিয়া সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা। যোগ ও সঙ্ঘ—পরস্পর এমনই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, যে একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর অস্তিত্ব অসম্ভব বলিলেও চলে। বরং যোগ সঙ্ঘ ব্যতীত চলিতে পারে; কিন্তু সঙ্ঘ যোগসিদ্ধ। বিনা যোগে ইহার উৎপত্তি একান্তই কাল্পনিক, পরন্তু সত্য নয়।

এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর সংযোগ নানা উপায়ে সংসাধিত হয়। পরস্পর যুক্ত হওয়ার কথা আমরা নিত্য শুনিয়া থাকি। একজন আর একজনের সহিত যোগ দিয়াছে, একদল অপর দলের সহিত যুক্ত হইয়াছে; এক জাতি অপর জাতির সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রবল হইয়াছে। গণিতের সঙ্কেতে যোগে সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়, পাঁচের সহিত পাঁচের যোগে দশ হয়। যোগ ভেদ দূর করে—নদীর এক কূল হইতে অপর কূলে সেতু বাঁধিয়া, 'একা নদী বিশ ক্রোশ' এই অপবাদ দূর করে। যোগে দুর্গম যাহা তাহা অনায়াস-সাধ্য হয়; দুর্ব্বল প্রবল হয়, ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়, অল্পের পরিমাণ বাড়ে—যোগ জীবননীতির শক্তি বলিতে হইবে।

তোমায় আমায় যোগ বুঝি; যোগ তত্ত্ব-কথা বলিলেই মাথায় হাত দিয়া বসিতে হয়। কিন্তু যাহা বুঝি তাহা কতখানি সত্য, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়। তোমার সহিত আমার

যোগ সত্যই কি সিদ্ধ? তাহা যদি হইবে, তাহা হইলে বিয়োগের সম্ভাবনা ঘটে কেন?

পরস্পর স্বতন্ত্র সামগ্রী—পরস্পর যুক্ত হইলে যোগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই আবার বিয়োগ হওয়া বিচিত্র কথা নহে তো!

সাধারণতঃ, যোগের পরিণতি ইহার অধিক আলো দেয় না। কার্য্যকারণবশতঃ যোগ; ইহার পরিবর্ত্তনে যোগভঙ্গ অনিবার্য্য। যে প্রয়োজনে যুক্তি, সে প্রয়োজন সিদ্ধ হউক, অথবা তাহার দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধির অভাব বুঝিলে, যোগেরও প্রয়োজন ফুরায়—ইহা আমরা নিত্য দেখি। কেহ কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইল, আবার কোথাও বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিল—এই সকল নিত্য ঘটনার মধ্যে যোগ বিয়োগের খেলা পরিদৃষ্ট হয়। এই সহজ খেলার শিল্পের উপরেই এমন একটী নিত্যসিদ্ধ যোগের আবিষ্কার হয়, যাহার উপর ভর করিয়া সঙ্ঘ গড়িয়া উঠে। সঙ্ঘ যোগপ্রতিষ্ঠ হইলেই ইহা সঙ্ঘ; নতুবা সঙ্ঘের নামে ইহা অভিনয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সঙ্ঘ ধর্ম্ম; ইহার ভিত্তি নশ্বর হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে এবং তাহা যুক্তি-বিরুদ্ধ।

অটলপ্রতিষ্ঠ সঙ্ঘসৃষ্টির স্বপ্ন সফল করার বজ্রসঙ্কল্প নিত্য যোগের উপর নির্ভর করে। কাজেই যোগচ্যুতির মৌলিক হেতু যাহা, তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সাধকমণ্ডলীকে চলিতে হয়।

যোগ ও সঙ্ঘের সহিত আমরা কোন অপার্থিব অলৌকিক সামগ্রীর সংশ্রব রাখিয়া এই প্রসঙ্গের অবতারণা করি নাই। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপর দাঁড়াইয়া, এই দুইটা চক্ষু দিয়া

যাহা ধরা যায় তাহার উপর ভরসা রাখিয়াই দেখাইতে চাই—তবুও আমরা কি করিতে পারি।

যোগে শক্তিবৃদ্ধি হয়। যোগের পরিমাণ যেরূপ হইবে, শক্তির বেগও তদ্রূপ হইবে। এই শক্তি যৌগিক—পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত ইহা প্রবল হইবে।

জীবনের জন্যই যোগের প্রয়োজন। জীবন নশ্বর বলিয়া যাহার ধারণা, তাহার মৃত্যু কামনা করা উচিত। যোগ বলিয়া এই শ্রেণীর লোকের যে সাধনা তাহা মৃত্যুরই আরাধনা। আমরা জীবন সার্থক করার বিধানকেই যোগ বলিতেছি; এবং এই যোগাযোগের পরিমাণ করিয়াই আমরা প্রাণের দৌড় দেখিতে পাই। যোগবৃদ্ধির সহিত প্রাণের বেগ বাড়িবে, ইহা অবধারিত।

জীবনের এই অমৃত-তত্ত্ব অটুট রাখার পথে অন্তরায় যাহা এইবার তাহা দেখিব। হিসাব করিয়া দেখিলে, অন্তহীন অন্তরায় যে বাহির হইবে তাহা অবধারিত এবং এই জন্যই নৈরাশ্য; কিন্তু বিঘ্ন-সমূহের উৎস অসংখ্য নহে। উহাদের মূল কেন্দ্র যদি রুদ্ধ করা হয়, বিকীর্ণ বিঘ্নরাশি আর যোগ ব্যর্থ করিতে পারিবে না। জয়ের আশা তাই দুরাশা নহে।

কোন বিশিষ্ট কর্ম্মের উদ্দেশ্যে যে যোগ, কর্ম্মান্তে বা কর্ম্মসিদ্ধির পথে ইহা যথেষ্ট নহে—এই বোধের উন্মেষে উহা পরিত্যক্ত হইতে পারে। এই কর্ম্ম নানাবিধ—বাহিরের ও অন্তরের। নাম, যশঃ, প্রতিপত্তি-লাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্তর বাহির উভয় দিক্ হইতেই হয়; এমন কি, মুক্তিমোক্ষের আকাঙ্ক্ষা

পর্য্যন্ত ইহার অন্তরায় বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। এপথের যাত্রী যারা তাদের এইগুলি বিসর্জ্জন দিয়া পথ চলিতে হইবে।

কথা খুব সাংঘাতিক। একটা জাতির যোগের লক্ষ্য সম্বন্ধে যে দৃঢ়মূল ধারণা, তাহা উপাড়িয়া ফেলার কথা হঠকারিতা বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু যোগ ও সঙ্ঘ জীবনেরই উৎকৃষ্ট পরিণতি বলিয়া, জীবন যাঁহারা চাহেন না তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম।

দেশ ও জাতি সম্বন্ধে মুক্তিমোক্ষ-প্রয়াসীর চিন্তাধারার মৌলিক যোগসূত্র না খুঁজিয়া পাওয়া গেলে, সে চিন্তাধারা নিষ্প্রয়োজন-বোধেই অবশ্য বর্জ্জনীয়। কেবল সংস্কার-ক্ষয়ের জন্য এই বিপরীত চিন্তার দুর্ব্বিসহ ভার একটা জাতি ও দেশ বহন করিতে ক্রমে অসমর্থ হইতেছে। ধরিত্রী সেই সন্তানের অত্যাচার ঔদাসীন্য প্রভৃতি ঝঞ্ঝাট বহিতে কাতর নহেন, যে সন্তান ক্লেদহীন হইয়া একদিন কৃতযুগ তাহার বক্ষে নামাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে।

যোগ তথাকথিত কোন কর্ম্মসিদ্ধির হেতু নহে। যাহার সহিত যুক্তি চাহি, তাহার আচরণ যোগভঙ্গের কারণ হইতে পারে; এইজন্য মনে রাখিতে হইবে—আমাদের আকর্ষণের বস্তু মানুষের চরিত্র নহে, কোন আদর্শ নহে—আমরা চাহি যোগ; পরস্পরের মধ্যে অকল্পিত ভাব ও কর্ম্ম, তাহা অতি কদর্য্য অথবা শ্রেষ্ঠ হউক, আমরা সে বিষয়ে উদাসীন থাকিব।

সৎ যাহা, তাহা বরণ করা দুঃসাধ্য নহে; অসৎকে উপেক্ষা করিয়া যোগসিদ্ধ হওয়াই তপস্যা। ভগবানে মানুষে যে যোগ

সে-যোগ ভাগবত; মানুষে মানুষে যুক্তি সৃজন করিয়া যে চিৎশক্তির প্রকাশ, তাহাই বীর্য্যময়, নব সৃষ্টির উৎস। ভাবযোগী ঘরে ঘরে, কিন্তু মানুষে মানুষে মিলনের ঝোঁক কেহ বহিতে রাজী নহে। চক্ষের সম্মুখে ধর্ম্মের নামে পঙ্গু কিম্পুরুষের দলবৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়াও আমরা ফাঁকি দিতে ছাড়ি না। নির্ভীক বজ্রধর তরুণ, এই অন্ধ মোহ ভাঙ্গিয়া সাধনার প্রবাহ উজান দিকে ফিরাইয়া দাও। দেখিবে—মানুষের আবাদে, ইহজীবনেই মুক্তির মন্দাকিনী বহিবে, ধর্ম্ম অর্থের মহাবর্গ ফলিবে।

অসংখ্য বিঘ্ন—বিষয়টী স্পষ্ট করিবার জন্য উহার দুই একটীর এখানে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বার্থ এই যোগের পথে ভীষণ বাধা। চাই যোগ, এই জন্য যোগী নিঃস্বার্থ হইবে। যোগের জন্যই সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে।

আমরা দেখিব—মানুষ। জন্ম হইয়াছে—ইহারই জন্য চতুর্ভুজ হরিকে দেখার সাধ ধ্রুব প্রহ্লাদের ছিল; সে যুগের মন দিয়া তাহা সার্থক হইয়াছে। সে গত যুগ পুনরাবিষ্কার করার জন্য আজ আমাদের মাথাব্যথা নাই।

মানুষের সবখানি দেখার চক্ষু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কার করিয়াই সিদ্ধ হয়। এই আত্মাবিষ্কারের পথই তো যোগ। যোগের জন্য আমরা সকল আদর্শবাদ বিসর্জ্জন দিব। কামকাঞ্চনভোগেই যে কেবল কামনা তাহা নহে; অন্তর্য্যামী যাহা চাহেন না, তাহা যতই শ্রেয়ঃ বস্তু হউক, তাহা অন্তরে পোষণ করাই কামনাকে আশ্রয় দেওয়া। আজ জীবন-স্বামী

চাহিতেছেন পতিতের উদ্ধার—মৃত্যুর মধ্য দিয়া নহে; জীবন যে তাঁর বিভূতি, ইহার লয় তাঁহার লীলাকেই অস্বীকার করা। আমরা তাই জীবনকেই নিখুঁত করিয়া গড়িয়া তুলিব; সে নীতি জীবনের আশ্রয়েই সফল হইবে। জড়ের আসক্তি যেমন পরিত্যজ্য, তুরীয় বস্তুর প্রতি আসক্তিও তদ্রূপ এই ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

জীবন নিষ্কলুষ নয়। তাহা যদি হইবে, তবে বিশ্ব আজ অতৃপ্ত হইবে কেন? সৃষ্টির সার্থকতা বিশুদ্ধতায়। আজ ভগবানের নাম গ্রহণ করিবে কে? যে মুকুরে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহা যে আবর্জ্জনাযুক্ত; জীবন বিশুদ্ধ হইলে, সত্য যাহা তাহা স্বতঃই প্রতিফলিত হইবে। যোগ সেই শুদ্ধি-বিধানে উদ্যত। এই জন্য এই অবস্থায় আদর্শ চরিত্রের প্রতি অনুরাগ অনধিকার-হেতু অর্থহীন। দেখিয়া যাইতে হইবে অকপটে, নির্ভীক চিত্তে—আশ্রয় ও আশ্রিতের কলুষরাশি যোগের উত্তাপে কেমন অনর্গল ধারা সৃষ্টি করে। শিহরিলে চলিবে না; অকাতরে পরিপাক করিতে হইবে—যত অন্যায়, অত্যাচার পৃথিবীতে সম্ভব। এই ভীম আবর্ত্ত উদ্ভিন্ন করিয়াই যে সাধক যোগরক্ষায় সমর্থ হয়, সেই তো মৃত্যুঞ্জয়ী শিব, সেই তো যোগেশ্বর।

যোগী যে তার যোগৈশ্বর্য্য ব্যতীত অন্য স্বার্থে আসক্তি শূকরপুরীষে রুচি ভিন্ন অন্য আর কি? যোগী তাই কাঙাল, পথের ভিখারী, নিরালম্ব।

মানুষে মানুষে যোগ এই ভাবে সাধিয়া চলিলে, একনিষ্ঠার

বলে প্রণয়ভঙ্গের সব কিছু কারণ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও, যুক্তি অভঙ্গ থাকে—এইখানেই সঙ্ঘের অঙ্কুর স্থান পায়।

এই যোগ ও সঙ্ঘের-রহস্য ভাষায় বুঝাইবার নহে। ইহা সাধিবার বস্তু। সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান সহযোগে যেখানে ইহার সাধনা, সেইখানে ইহার সিদ্ধতীর্থ। এই ক্ষেত্রে বাস করিয়া ইহার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়; এই তীর্থে মুক্তিস্নান করিয়াই যোগ ও সঙ্ঘের দীক্ষা লইতে হয়। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ভিন্ন যেমন প্রদীপ জ্বালা সম্ভব নহে, এই সিদ্ধ জীবনের সংস্পর্শ ভিন্ন সেইরূপ যোগ ও সঙ্ঘজীবনের অনুভূতি অসম্ভব।

এই যোগের মানুষকে একের জন্য সবই ছাড়িতে হয়। আবার ভগবানের জন্য গৃহত্যাগী হইতে দেখিয়াছ, মানুষের জন্য পাগলের দল সঙ্ঘেই দেখা যায়। ইহারা জীবনের সন্ধানে ছুটিয়াছে; তাই বিশ্বের বুকেই ইহাদের জয়দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ইহারা সন্ন্যাসী না গৃহী? তাহাও স্বরূপের দায়েই সুনির্দ্দিষ্ট হইবে। ভগবানের দায়—কল্পনা; মানুষকে অস্বীকার করার ছলনা। মানুষে মানুষে যোগ সাধিতে গিয়া আত্মহারা হইতে হয়, আপনার যাহা কিছু বিসর্জ্জন দিতে হয়। পিতা ছাড়িতে হয়, মাতা ছাড়িতে হয়, সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়। ইহাও তো বাহিরের ত্যাগ; অন্তর হইতে ঘৃণা বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে হয়, আসক্তি সংহৃত করিয়া রতি স্থির করিতে হয়। মানুষের সবখানিকে এমন ভাবে দোরস্ত করিতে হয়, যাহাতে পৃথিবীর কোন ঘটনাই যেন তাহাকে দীক্ষার ক্ষেত্র হইতে টলাইতে না

পারে। বুদ্ধিকে স্বরে বাঁধিতে হয়; হৃদয়, প্রাণ, দেহযন্ত্রও যাহাতে বেসুরা না বাজে তাহার জন্য সতর্ক থাকিতে হয়। শুধু নিজের জীবনের সুরে মজিয়া থাকিলে আবার যোগের কাজ সবখানি সিদ্ধ হয় না; তাই কাণ পাতিয়া যাহাতে মজিয়াছি, তার সুরটী ধরিয়াই ধীরে ধীরে প্রতি মূর্চ্ছনায় জীবনের সুর বৃহৎকে জড়াইয়া আবার বাঁধিয়া লইতে হয়। যে সুর জীবনের সুর নয়, এমন কিছুর মধ্যে সুরের স্রোতঃ চলিলে তখনই আটক পড়িতে হয়; আবার দুজনায় চোখাচোখি হয়, ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে, দুজনেই আবার জীবনযন্ত্র সমান করিয়া বাঁধিয়া লয়—সকল যন্ত্র এক সুরে বাজিয়া উঠে। এই ঐক্যতানই সঙ্ঘের দীক্ষা।

আলো দেখিয়া পতঙ্গের মৃত্যুকামনার মত, মানুষ-মজান সুরে মানুষ আসিয়া ধরা দেয়। দুই তিন হয়, তিন ছয় হয়। তারপর আয়তন গুণান্বিত হইতে থাকে—সৃষ্টির বেগও বাড়িয়া যায়। মানুষের দায়েই কেহ বা উদাসী, বাউল; কেহ বা গৃহী, সংসারী। সে মানুষ স্বরূপের মানুষ; তাই ভেদহীন। তাই যে রূপের মানুষ যে কেহ হউক না কেন, সুরে সকলেই ভিড়িয়া থাকে; মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্যের অন্ত থাকে না। এ একটা নূতন পৃথিবীসৃজনের সিদ্ধ বীজ।

মানুষ চায় মিলন—মানুষে মানুষে মিলিয়া প্রেমের বৃন্দাবন সৃষ্টি করিতে। মিলনের মূল সূত্র ধরিতে হইলে, সব যে ছাড়িতে হয়। এইখানেই ঘটিয়াছে বিপদ্। ভগবানের জন্য জগতে অনেকে অনেক কিছু ছাড়িল; মানুষ যদি সে বস্তু হইতে

পৃথক্ হয়, তবে এ সৃষ্টির সত্য পুনরাবিষ্কার করিতে হইবে। আর যদি অভেদ তত্ত্ব হয়, তবে পাইয়াছি তাহাই যাহার জন্য শুক সন্ন্যাসী, নারদ পাগল, শঙ্কর বুদ্ধ উদাসীন ভিখারী।

কিন্তু এই পাওয়া তো মুখের কথা নয়! পত্নী স্বামীকে পায় কখন, যখন করে সে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ। ভাই ভাইকে পায় কি—যদি নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ উভয়ের মধ্যে দীপ্ত আগুনের মত জ্বলিয়া না উঠে? কোথায় এই মিলনের সাধনা আরম্ভ হইবে—এ বিচার থাকে না, যখন যোগের ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষা হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে। আর আমাদের মনে হয়—সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যের নিত্য বীজ আছে। কপট যে, পরশ্রীকাতর যে, তারা এই বীজেরই নিত্য স্বরূপ। বীজের বিধাতা যিনি ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। লোকের ভাল মন্দ বিচারে, কেহ কি কপট দেশদ্রোহী হইতে বিরত হয়? মানুষের চক্ষেই ভাল মন্দের বৈষম্য। বিশ্বকর্ম্মা ভাল মন্দ সৃষ্টি করিতে পারেন; কিন্তু শুধু ভালতেই হয়ত তাঁহার আনন্দ নহে, মন্দের মধ্যেও তিনি মধু আস্বাদ করেন। এইরূপ সঙ্ঘের নিত্য বীজ আছে; স্বরূপের দায়ে যুগে যুগে ইহারা সম্বন্ধযুক্ত হয়—ধরিত্রীর পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্য। আজ সঙ্ঘ-তত্ত্বের আবির্ভাব আমরা দিব্য চক্ষে লক্ষ্য করিতেছি। হৃদয়-যন্ত্রে অনাহত ধ্বনিতে এই সংবাদ দিবানিশি বাজিতেছে। এই হেতু যুগের মানুষ যারা তাদের সঙ্ঘত্বই ধর্ম্ম; আর সেই সঙ্ঘ গড়ার জন্য যে আত্মসমর্পণ-যোগ তাহা তাহাদের সিদ্ধ সাধনা। ইহার মধ্যে আদৌ কৃচ্ছ্রতা নাই; ইহার সরল অভিব্যক্তিতে তাই জগৎ একদিন ছাইয়া

যাইবে। সেদিন জাতি-ভেদ দূর হইবে। ধরিত্রীর ঐশ্বর্য্য লইয়া মানুষ এমন করিয়া কাড়াকাড়ি করিবে না। আজিকার স্বার্থ-প্রাচীর-ঘেরা মানুষের হিংস্র বুভুক্ষা-রূপ ব্যাধি দূর করিয়া সঙ্ঘ নূতন ভঙ্গীতে, নূতন প্রণালী ও ধারায় নব সৃষ্টি রচনা করিবে।

* *
*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগ—কল্পনা নয়। কল্পনায় মানুষ কত কি না হইতে পারে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; কিন্তু প্রতিবিম্বের মত উহা জগতের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করে না, সুন্দর আদর্শ সৃজন করে মাত্র। কল্পনার প্রভাবে মজিয়াই এদেশে জীবনসাধনার নির্দ্দেশ অতীতে ব্যর্থ হইয়াছে; আজ সাধনা বস্তুতন্ত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হওয়ায়, ইহার প্রভাব ভবিষ্যৎকে সুপথে পরিচালিত করিবে, এইটুকুই আমাদের আশার কথা। উৎসর্গের সাধনা আজ ঋজু পথেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পথের চাপে দুর্গম গিরি-পথ আজ সুগম ও সুসাধ্য—যোগজীবনের ন্যায় সঙ্ঘসাধনার পথেও যে সকল অদৃশ্য অন্তরায় তাহা জীবনে অভিব্যক্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য ধরা দিতেছে। ঈশ্বরের বিধান সফল হইবেই, ইহা যে অবধারিত।

ভগবানে উৎসর্গ—ইহা লইয়া দ্বন্দ্ব নিষ্প্রয়োজন। কোথায় উৎসর্গ করিব—ভাবের ঘরে চুরি না থাকিলে তাহার ধারণাও আজ আর বাঙ্গালীর কাছে অস্পষ্ট নহে। ঈশ্বরপথের মার্জ্জিত-বুদ্ধি তরুণ পথিক হৃদয়ের সহিত গুরু-তত্ত্ব বরণ করিয়া লইতে আজ আর অনেক ক্ষেত্রেই কুণ্ঠিত নহে—অসাধারণ জীবন-জয়ের অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা যেখানে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়াছে, মানুষের

মধ্যে ভগবানের অবতরণের কথায় সেখানে আর কোন অপ্রত্যয় নাই। ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রাপ্তবোধেই সাধনার আরম্ভ; মৃত্যু-পণ সঙ্কল্পে এই সাধনার প্রবাহই বায়ু-তরঙ্গে সঞ্চালিত হইয়া দিগ্-দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে; তাহা হইতে কোন সাধকের মুক্তি নাই। অলক্ষ্যে এই মহিমাময়ী মহাশক্তি প্রতি খাঁটি ঈশ্বরবিশ্বাসীকে অমৃত দান করিতেছে—মৃত্যুর মধ্য দিয়াও সে অফুরন্ত তৃপ্তির ছেদ নাই, শেষ নাই। জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-দোলা স্থির হওয়ায় তুল্য রূপে সকল ঘটনা বরণ করার অধিকার সাধকমণ্ডলীকে স্পর্দ্ধান্বিত করিয়াছে।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আত্মসমর্পণযোগের দীক্ষায় দেশ উদ্বুদ্ধ হইলেই চলিবে না। এ যোগের সন্ধান অনেকেই পাইতে পারেন। ইহার সূচনা আজ নূতন নয়। অতীতের আবর্ত্ত হইতে ইহাকে আবিষ্কার করিবার জন্য যে সংগ্রাম তাহা আজ পরিসমাপ্ত হইয়াছে; যাহা আজিও অপ্রকাশ, অমূর্ত্ত, তাহাই প্রকাশ ও প্রকট করিয়া তুলিতে হইবে। ভারতে এক ঈশ্বরকোটী জীবনের জাতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। সঙ্ঘ তাহার সিদ্ধবীর্য্য। দেশের সংহতি, মণ্ডলী, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মসাধনের জন্য যে সকল মিলন-কেন্দ্র, সাম্প্রদায়িকতার অহমিকা উন্মূলিত করিয়া সেখানে সৃষ্টির সিদ্ধ বীজ সঞ্চারিত করিতে হইবে। ইহা অভিনব বস্তু। ভারতে ধর্ম্মসাধনার পথ আবিষ্কার করা শক্ত নয়; কিন্তু ভারতের সমগ্র প্রাণশক্তিকে অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও জীবনে তাহার সিদ্ধ মূর্ত্তিটীকে ফলাইয়া তোলা কঠোর তপঃ-সাধ্য। সাধনাতো ভগবানকে

পাওয়ার জন্য নয় ; সাধনা ভগবানকে জীবনে মূর্ত্ত করা, ঈশ্বর-কোটীর থাক হওয়া। ভবিষ্যতের জাতি এই সিদ্ধ নীতিরই অনুসরণ করিবে, সঙ্ঘের সিদ্ধিই জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইবে।

দীক্ষিত যে, তাহাকে অবধারিত গোত্রান্তরিত হইতে হয়। দীক্ষার পরও যদি থাকে পিতৃ-মাতৃ-সম্বন্ধ, পত্নী-ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ, আত্মীয় স্বজনের সহিত অতীতের সম্বন্ধ-সূত্র, বুঝিতে হইবে—প্রকৃতির ছলনায় তুমি বিভ্রান্ত ; দীক্ষা সেখানে কল্পনা মাত্র। দীক্ষান্তেই হইবে—ঈশ্বর-সম্বন্ধ। তাহা এক অদ্বয় বস্তু। দীক্ষার পর অভিনব সম্বন্ধে সকল হৃদয়বৃত্তির সঙ্কোচন অবশ্যম্ভাবী। ছড়ান মন, ছড়ান বৃত্তি গুটাইয়াই ভগবান তোমায় নিঃস্ব করিয়া দেন ; নতুবা তুমি কি দিতে পার, তোমার দিবার শক্তি কোথা ? দীক্ষার শক্তি যদি তোমায় সদ্য মুক্তি না দেয়, তবে তাহা এ যোগের দীক্ষা নয়। ক্রম-মুক্তির যে দীক্ষা, সে দীক্ষা নামে দীক্ষা ; পরন্তু তাহা শিক্ষার যুগ—বিনা শিক্ষায় দীক্ষার অধিকার জন্মে না। এই সরহস্য দীক্ষাবিজ্ঞান আমরা "আত্ম-সমর্পণ-যোগ"-গ্রন্থে বিস্তারিত প্রকাশ করিয়াছি। দীক্ষা মূর্ত্ত হইয়া যেখানে সাধকমণ্ডলীকে গোত্রান্তরিত করে, সেখানে সংসারে সমাজে অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় মহাবিপ্লবেরই হাহাকার তুলে। তুলিবারই কথা—এমন করিয়া আপনার জনকে একটী মুহূর্ত্তে পর করিয়া সাধক যখন ঈশ্বরকোটীর থাকে উঠিয়া দাঁড়ায়, তখন অতীত জগতের কণ্ঠে যে শোকার্ত্তনাদ উঠে তাহা হৃদয়-ভেদী হইবে বৈ কি! সমাজের বুকে, শাম্ভবী, শাক্তী অথবা

মান্ত্রী দীক্ষার মহাপ্রবাহ যদি গর্জ্জিয়া উঠে, তাহা কি দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে—অবধারণ করিও। ক্রম-মুক্তির দীর্ঘ পথে পেঁচ খুলিতে খুলিতেই সাধক পিষিয়া হায়রাণ হয়; ঈশ্বরের ডাকে জাগ্রত সন্তান—সে ক্ষিপ্র মুক্তির সিদ্ধ মার্গই এক মুহূর্ত্তে বাছিয়া লয়। এই বীরযোগীর দল লইয়াই সঙ্ঘ-সাধনার ভিত্তি-পত্তন। জাতির সম্মুখে এই সদ্যমুক্তির পথ যতই প্রশস্ত হয়, ততই তাহার ও জগতের অশেষ কল্যাণ।

গোত্রান্তরিত সন্তানের হৃদয়ে অশেষ সান্ত্বনা, অশেষ তৃপ্তি—অতীতের কাতর ক্রন্দন তাহার স্থিতিকে টলায় না। যে দিব্য দৃষ্টি ফুটে, তাহা যে সত্যকেই স্পষ্ট লক্ষ্য করে। জন্ম, গোত্র, বংশ, জাতি, দেশ, ধর্ম্ম, সব যে তাহার দীক্ষায় আলোকিত, পুলকিত—কোটী জন্মের আবর্জ্জনা-স্তূপ হইতে সে মুক্তি পাইয়াছে। যেখানে এত দৃষ্টি নাই সেখানে আছে কুণ্ঠা, দীক্ষার নামে সেখানে সে প্রতারিতই হইয়াছে, প্রকৃতি তাহাকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

এই গোত্রান্তরিত জীবনের অতঃপর চাই জন্মান্তর। ভগবানের সহিত সম্যক্ প্রকারে ঐক্য সাধন করিতে হইলে, ইহার প্রয়োজন-বোধ এমনই তীব্র হয় যে সময়ে সময়ে দেহত্যাগেও সাধক কাতর হয় না। এই আকুলতার মোচড় খাইয়া খাইয়া চেতনার সর্ব্ব স্তরে গর্ভবেদনার নিদারুণ ব্যথা জাগিয়া উঠে। অনেককেই এইখানে আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতে হয়। কল্পনার দীক্ষায় মানুষের চক্ষে ধূলি দেওয়া চলে, কিন্তু সঙ্ঘের অগ্নি-তীর্থে হৃদয়ের জুয়াচুরি ধরা পড়ে; এই অবস্থায় প্রকৃতি সম্যক্

প্রকারে আত্মস্বার্থ ছাড়িতে বাধ্য হয়। এইজন্য অন্তরে বাহিরে এই সময়ে যে মহাবিপ্লব বাধে, তাহা জয় করে যে দীক্ষিত সেই—অদীক্ষিত উৎসর্গ-ক্ষেত্র সঙ্ঘে স্থান পায় না। জন্মান্তর হইলেই, সত্যই অভাবনীয় ভাবান্তর উপস্থিত হয়। জন্মান্তরিত জীবন কখনও হিংসায় বিদ্বেষে, মানুষের অকল্যাণ-চিন্তায় একটি মুহূর্ত্ত দিতে পারে না; বিশ্বকল্যাণের নিত্য চিন্তায় তাহার সবখানি ভরিয়া থাকে। ইহারাই নূতন যুগের মানুষ।

কিন্তু জন্মান্তর হইলেও, সবখানি হইল না। পরিশেষে, একটা রূপান্তরের সাধনা চাই। ইহা সমাপ্ত হইলেই জগৎ সিদ্ধ হইল, বুঝিতে হইবে। এই শেষ সাধনস্তরে, এক মুহূর্ত্ত বহির্মুখী হওয়ার উপায় থাকে না। রূপান্তর হওয়ার সময়ে, মস্তিষ্ক-কোষ, পরিপাক-যন্ত্র, সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র সবই ওলটপালট হইয়া যায়। ভাগবত ইচ্ছার প্রত্যক্ষ আশ্রয়ে একটা আন্‌কোরা নূতন আধার-যন্ত্রই নির্ম্মিত হইয়া উঠে। এইরূপ দিব্য মানুষের যে সমষ্টি তাহাই সঙ্ঘ—যে অসাধারণ জীবনের উপর ভর করিয়া ভারত যথার্থ মানবকল্যাণে সমর্থ হইবে তাহা এই জন্যই সঙ্ঘ ব্যতীত সার্থক হইতে পারে না।

জাতির নির্ম্মাণ-যুগে, এই সঙ্ঘ-সাধনার তত্ত্ব গভীর ভাবেই প্রণিধান করিতে হইবে। প্রেরণা যেখানে সত্য, আত্মস্বার্থের প্রতারণা নাই, তাহাকে ঠেকিয়া ঠেকিয়া এই পথে আসিতেই হইবে। জাতি-সৃষ্টির জলন্ত বেদ আজ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হইলেও, কালে ইহা অমৃতেরই মত উপাদেয় বোধ হইবে। কুঁদের মুখে বাঁক যেমন আটক খায়, তেমনি একদিন পথহারা

জাতির ব্যথার শিহরণ মোচন করিতে খাঁটি কর্ম্মী মাত্রকেই এই নূতন তত্ত্বের আশ্রয় লইতে হইবে। জাতিগড়ার সন্ধিক্ষণে তাই সঙ্ঘ-সাধনার মন্ত্র ও পরিচয় নির্ভীক কণ্ঠেই প্রচার করিতে আমাদের এক বিন্দু বাধে না।

তবে দীক্ষা, গোত্রান্তর, জন্মান্তর, রূপান্তর, একটী একটী সাঙ্গ করিয়া যে সঙ্ঘ-সাধনায় উদ্যত হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমাদের মন সকল বস্তু খণ্ড খণ্ড করিয়াই ধারণা করে; কিন্তু ভগবানের সৃষ্টি অখণ্ড—বীজের ধ্বংসে যেমন নূতন সৃষ্টির অঙ্কুরশক্তি তাহা হইতে উদ্‌গত হইয়া যথাকালে রূপ গ্রহণ করে ও পরিপুষ্ট হয়, তেমনি দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই একটী পর্য্যায়ের পশ্চাতে আর একটী পর্য্যায় স্বতঃই দেখা দেয়। বস্তুতঃ, ভিতরে সব স্তরগুলিই যুগপৎ আপনা আপনিই গড়িতে থাকে; প্রয়োজনানুযায়ী অখণ্ড সঙ্ঘজীবনে কোথাও একটী, কোথাও বা অন্যটী প্রকাশ পায়। সময় আসিলেই, লোক যাহা দেখে নাই, ভাবে নাই, তেমন আচরণ দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। তাহারা প্রথমে কেমন করিয়া এমন হইল তাহা বুঝিতে পারে না, মনের বিচার দিয়া অনেক ভ্রান্ত কল্পনা করিয়া থাকে; কালের সঙ্গে যতটুকু বুদ্ধি বুঝিতে পারে, ততটুকু স্বীকার করিতে করিতে আপনার খণ্ড দর্শনের পরিচয় পাইয়া থাকে। দীক্ষিত সন্তান এই ভাবে চলে না। দীক্ষিত প্রথম একজনের কাছেই আপনাকে ধরা দিতে শিখে, একজনই প্রথম দীক্ষিতকে নূতনের ক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দেখে। এই দুই জনের চোখাচোখি ও পরস্পর স্বীকৃতিই উভয়ের মধ্যে দীক্ষাকে সপ্রমাণ করে।

ইহার অভাব হইলে, দীক্ষারই অভাব বুঝিতে হইবে। মোট কথা, দীক্ষার বীর্য্য এককালে সবগুলি পর্য্যায়ের জন্যই সাধককে প্রস্তুত করে ও যথাকালে যথাযথ প্রকাশের দ্বারা সঙ্ঘের তাৎপর্য্য লোকচক্ষে ফুটাইয়া তুলে।

সঙ্ঘের আর একটী বিশেষত্ব—ইহার আয়তন যতই সুবিস্তৃত হউক, ইহা একটী গোষ্ঠীর মতই আচারে, সমাজে, ধর্ম্মে, শিক্ষায় জীবনকে ছড়াইয়া চলে। সঙ্ঘে ভেদ থাকিতে পারে না। কেবল মতামতের ক্ষেত্রে নয়, সর্ব্বত্র একের প্রয়োজনে অপরে আত্মপ্রয়োজনের দাবীর মতই সবখানি স্বার্থ হাসিমুখে উৎসর্গ করে; কোথাও দানের গৌরব স্থান পায় না, কৃচ্ছ্রতায় হীনতায় মলিন করে না। ইহাই সঙ্ঘের অপার্থিব নিঃস্বার্থপরতা। আসল কথা, সকলের স্বার্থ এক হওয়া চাই; এই জন্যই এক হইতে বাধে যাহাতে তাহা বিষের মত পরিবর্জ্জন করিতে সঙ্ঘের প্রাণ সতত প্রস্তুত থাকে। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই সঙ্ঘের সিদ্ধ ছাঁচ গঠিত হয়। সঙ্ঘ ঐহিক স্বার্থের অমৃত-নির্য্যাস, সমগ্র জাতির আশাকল্পতরু। এই নবশক্তির পাঞ্চজন্য-ফুৎকারে মুমূর্ষু জাতির বুকে আশার স্বপ্ন মুকুলিত হউক।

* *

*

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সঙ্ঘ-শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত। বৌদ্ধযুগে এই শব্দ ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বৌদ্ধভিক্ষুগণের কণ্ঠে ধ্বনি উঠিয়াছিল—"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।" ইহার পূর্ব্বেও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সঙ্ঘ-সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়।

"সংহন্যতে পরিচ্ছিদ্যতেঽনেনেতি সঙ্ঘঃ"। সঙ্ঘের ইহাই ধাতুগত অর্থ। সম্+হন্ ধাতু, হন্ অর্থে গতি; অতএব সংগচ্ছতি—সমভাবে যাওয়া। 'সম্'-এর আবার অর্থ—আভিমুখ্য; এক লক্ষ্যাভিমুখে সমূহের যাত্রাই সঙ্ঘ-সংজ্ঞায় অর্থ জ্ঞাপন করে। ঋষির কণ্ঠে একদিন এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহাই আজ জাতির মন্ত্র :—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং
সংবো মনাংসি জানতাম্॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্॥

সুতরাং এই ক্ষেত্রে স্বজাতি-বিজাতি বিরোধ নাই; 'অভিপ্রায় যদি এক হয়—তবে এক মন্ত্র, এক সত্যই সকলের আশ্রয় হইবে, মনও এক হইবে। চিত্তভেদ থাকিবে কেন? এক সঙ্গতি,

এক সংবাদ, এক সম্মতি, এক সংজ্ঞা'—একটা অখণ্ড জাতিই ইহাতে গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু এই অধিকার সকলের হয় না। ঋষির মন্ত্র ঋষিমণ্ডলীর মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল। ঋষিকুলের একটা শিক্ষা ছিল, সাধনা ছিল। তাঁহারা তদনুসরণে প্রকৃষ্ট চরিত্র গড়িয়া তুলিতেন। সত্য, দান, ক্ষমা, তপঃ, অহিংসা, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার হইয়া, তাঁহারা সর্ব্বজন-পূজিত হইতেন। এই চরিত্র-লাভ যে কেবল ব্রাহ্মণজাতির এক-চেটিয়া সম্পত্তি ছিল, তাহা নহে; তবে ভারতের ব্রাহ্মণজাতিই ইহার অনুশীলন-ব্রতী ছিলেন—অন্য জাতির প্রতিভা সে যুগে এই উন্নত আদর্শ লাভ করিবার জন্য উদ্যত হয় নাই। তবে অন্যান্য জাতিকে এই অধিকার দিতে আজিকার স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় সে যুগের ব্রাহ্মণ কুণ্ঠিত হইতেন না। তখন ভারতে ব্রাহ্মণ জাতিগঠনের আদর্শ ছিলেন। গুণানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও, শিক্ষা ও সাধনার ভিতর দিয়া অপর জাতিকে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মে তুলিয়া লওয়ার প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। মানব-মনের ইহাই তো সত্য ও সহজ প্রেরণা। ভারতের ধর্ম্মই ছিল ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম। আজ খ্রীষ্টান জাতির অন্তঃপ্রেরণা যেমন জগৎকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া স্বজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি-সাধনে উন্মুখ, ইস্‌লাম-ধর্ম্মী জগতে ইস্‌লামজাতিগঠনে অতীতের মত বর্ত্তমানেও অগ্রিমুখী, বৌদ্ধধর্ম্মে মানবজাতিকে দীক্ষা দিবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণের অভিযান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা—তদ্রূপ ভারতের ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্ম শ্রেণীবিশেষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। শাপগ্রস্ত নহুষ অজগর মূর্ত্তিতে বৃকোদরকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, যুধিষ্ঠির

তাহার প্রশ্নের যে সকল সদুত্তর দিয়া ভ্রাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণবর্ণিত ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—"যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ এবং যে সকল ব্যক্তিতে উহা লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র; শূদ্রবংশীয় হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে।"

ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায়/যে মানুষে মানুষে যে ভেদ ও স্বতন্ত্রতা তাহা শিক্ষার গুণেই অপসারিত হয়।

অখণ্ডের উপলব্ধি—সঙ্ঘ-তত্ত্বের মূল কথা। কিন্তু যে শিক্ষায় ও সাধনায় ইহা জীবনে সম্ভব হইতে পারে, সে শিক্ষা ও সাধনা যাহার নাই, তাহার পক্ষে ইহা কোনদিন সম্ভব হইবে না। সঙ্ঘ চায়—একত্ব। এই একত্বের জন্য নিজেদের মধ্যে একটী মূল-তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে। সেই তত্ত্বে আত্ম-লয়ে যদি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় বুঝিতে হইবে—সঙ্ঘ-চক্রে যে মূলতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতে আমার আস্থা ও শ্রদ্ধা নাই; অতএব এ ক্ষেত্রে আত্মলয়ের সাধনা দুঃসাধ্য। এরূপ মানুষকে অপসারিত হইতে হইবে। লয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্য-নাশের আশঙ্কা থাকিতে এ পথে চলা কারও সাধ্যে কুলায় না; কেন না, সঙ্ঘ-সাধনায় ব্যক্তিত্বের মূল্যবৃদ্ধির হিসাব রাখিলে চলে না, সঙ্ঘকে সিদ্ধ করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে হয় এবং এই যে আত্মপ্রসাদ তাহা সমগ্র সঙ্ঘের চিত্তেই যুগপৎ তরঙ্গ তুলে। আকৃতি যেখানে এক, সেখানে ভিন্ন প্রেরণা ও অনুভূতির স্থান নাই।

অধুনা শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে লয়ের সাধনা মারাত্মক বলিয়াই মনে হয়। মনে হওয়া অযৌক্তিকও নহে। কেন না, লক্ষ্য-পথে চলিতে হইলে—মানুষের সবখানি যে পরস্পরের সহিত সমান করিয়া তুলিতে হইবে, ইতিহাসে এমন ঘটনা মিলে না। খ্রীষ্টান জগতের এত বড প্রভাব—ব্যক্তির মূল্য বাড়াইয়াই; জাতির শ্রেয়ঃসাধনের লক্ষ্যে তাহাদের সমূহ শক্তি সৃষ্টি করিয়াই তাহারা সাফল্য লাভ করে। সেখানে "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং"—এমন দুরূহ অর্থপূর্ণ মন্ত্রধ্বনির ঝঙ্কার তুলিতে হয় না।

কিন্তু ভারত যে সৃষ্টি চাহে, যে জাতি চাহে, যে দেশ ও সাম্রাজ্য গড়িতে চাহে, তাহা খ্রীষ্টান জগৎ নহে—তাহা ধর্ম্মরাজ্য। ভারতের এই ধর্ম্ম নীতি-কথা নহে, ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠা করা নহে. সঞ্চয়ের উপাসনা নহে —ইহা ঈশ্বরের সহিত জীবের যুক্তিরাজ্য। এই মূল-ধর্ম্ম চাহি না বলিলে ভারতের সত্তা শুনিবে না; ঘুরাইয়া জাতির উদ্দাম গতিকে গভীরতর আবর্ত্তময় করিয়া তুলিবে। আমাদের বিশ্বাস —কঠিন ও দুর্ব্বোধ্যবোধে ইহা উপেক্ষা করিয়া আশু কর্ম্মসিদ্ধির জন্য জগতের অধিকাংশ প্রাণও যদি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলেও সমস্যা এমনই জটিল হইবে, যে ভবিষ্যতে আর এক পদ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না।

ভারতের শিক্ষা, ভারতের বেদ্য—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মবিদ্ জাতির গোড়া যদি উপ্ড়াইয়া যায়, তবে তাহার অঙ্কুর-পুষ্পের আশা দুরাশা নহে কি? চাই জাতি। পুষ্প ও ফল সংগ্রহ

অগ্রে কর, তাহার পর বৃক্ষের চিন্তা করিব—ইহা যদি অধিকাংশ লোকেরও মত হয়, তাহা প্রলাপ বলিব—কেন না, ইহা যুক্তিহীন।

দুর্গম তপঃসাধ্য বলিয়া আমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব কেন? ইউরোপে সেদিন পর্য্যন্ত যে দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের রাজ্য ছিল, তাহা দেখিয়া কে আশা করিত—একদিন তাহার সভ্যতা জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে? সে দিন ইহা কল্পনা করাও বোধ হয় সঙ্গত হইত না।

আজ আমাদের ভিতরে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম লইয়া যে বিরোধ, ইহার মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে ভারতের সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর এই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যকে ঘিরিয়া দলে দলে ঐক্যবদ্ধ জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই বিভিন্ন পরস্পর-বিভক্ত দলে দ্বন্দ্ব, কলহ, সংগ্রাম হইবে, পরস্পর পরস্পরকে গ্রাস করিতে, নাশ করিতে উদ্যত হইবে, ইহাতেও আশঙ্কার তো কোন হেতু নাই! এক বিপুল সংহতিই তো চাই এবং সেই সংহতিই তো প্রলয়-ঝড় বহিয়া জাতি-রূপে অটল পদে দাঁড়াইয়া উঠিবে—যেখানে অনেকের সঙ্গতি, সম্মতি, চিত্ত, মন এক। ভারতের সত্য জীবন দিয়া এই ভাবে উপলব্ধি না করিলে জাতির অমোঘ বীর্য্যলাভ সম্ভব হইবে কেন?

আত্মসঙ্গতি ছাড়িয়া দাও। যদি কুণ্ঠা হয়—অপসৃত হও। তোমার বিভিন্ন সম্মতি সংহৃত কর; অখণ্ড সম্মতি হউক তোমার অন্তরের বাণী। যদি অসম্মত হও—সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রলোভন সৃজন করিও না, সত্যকে বরণ করিতে দাও। তোমার চিত্ত

মন লয় করিয়া যদি অখণ্ড মন ও চিত্তে আপনাকে সঙ্ঘময় করিতে না পার—সাধন-ভ্রষ্ট তুমি, তোমার স্বার্থ লইয়া দূরে গিয়া দাঁড়াও—সঙ্ঘচক্রের গতি তোমায় ঠিক্‌রাইয়া বাহির করিয়া দিবে।

যে সাধনায় এই লয় সম্ভব হয়, তাহাই ভারতের সাধনা। যে তত্ত্ব আশ্রয় করিলে, এই ঐক্যবদ্ধ বজ্র-দৃঢ় সঙ্ঘ গঠিত হয়—তাহাই ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য যেমন ব্রহ্মাকারা চিত্ত-বৃত্তির প্রয়োজন, তদ্রূপ সঙ্ঘকে পাইতে হইলেও সঙ্ঘাকার চিত্ত মন গঠিত হওয়া দরকার।

বাংলায় বৈষ্ণব-সাধনায় অতর্কিতে ভারতের এই তত্ত্বই মূর্ত্ত হইতে চাহিয়াছিল। বৈষ্ণব জাতির মধ্যে স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ দূর হইয়াছিল। উনষষ্ঠি সাধনাঙ্গ শেষ করিয়া বৈষ্ণব সাধক পঞ্চাঙ্গ-সেবার প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন,—"স্বজাতির মহৎ সঙ্গ হয় তৃতীয়েতে"।

এই জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ নাই, চণ্ডাল নাই, নারী নাই, পুরুষ নাই—শ্রী-মূর্ত্তির সহিত আত্ম-লয় হইলে আর ভেদ থাকে না; তখনই বৃন্দাবনবাস সার্থক হয়। ইহাই তো নবসৃষ্টি—ইহাই ধর্ম্মরাজ্য, শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ-স্বপ্ন।

তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে অন্তরঙ্গ সাধনার দিকেই সর্ব্বশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। বাহিরের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলার দাবী এই অবস্থায় বিসদৃশ। সঙ্ঘব্রতী যদি সুনাম চাহে, লোকপ্রসিদ্ধি চাহে, বাহিরের চাওয়ায় কাণ দেয়, তবে বুঝিতে হইবে—সে ধীরে ধীরে আত্মস্থ হওয়ার পথ হইতে অপসৃত

হইতেছে। স্বজাতি-গঠনের বেদী গড়িয়াই ব্যাপ্তির পথে ঐ সকল সমস্যার মীমাংসা হইবে। যাহা সহজ ও সাধারণ, তাহাই তো চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত করে ; যাহা তপঃসাধ্য, অসাধারণ, সেইখানেই চিত্ত সংযত হয়। এই হেতু সুলভ বিশ্বাস ও কর্ম্মশক্তি জাতিগঠনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, আত্মস্থ হইয়া যে অন্তর্বিজ্ঞান, তাহাই এ পথের আলো ; আর দুর্জ্জয় ভাগবত ইচ্ছার প্রেরণাই শক্তি। ইহা যে সংহতি লাভ করে, সে যেটুকু করিবে তাহা বাহিরের টানে নয়, অন্তর্য্যামীর প্রয়োজনে—তাই তাহা মধুময়, কৃচ্ছ্র তার সেখানে লেশ মাত্র নাই।

এইজন্য সঙ্ঘ পাইতে হইলে, একটা অব্যর্থ শিক্ষানীতি প্রত্যেক সঙ্ঘব্রতীকে একনিষ্ঠ চিত্তে পালন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে জানিতে হইবে—সঙ্ঘ কি ? ইহাই তাহার শিক্ষাকাল। এই জানা প্রমাণজ ও কর্ম্মসাধ্য নহে। ইহা বস্তুর সহিত চিত্তকে তদাকার করিয়া জানিতে হয়। জানার ভিতর দিয়াই পাওয়ার স্পর্শ মিলে। তারপর সাধনার দ্বারা জ্ঞাত বস্তুর সহিত একাত্ম হওয়া সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধ-চরিত্র সঙ্ঘ ; যুক্ত-জীবন লইয়া ইহার অভিব্যক্তি। তত্ত্ব যদি সিদ্ধরূপ লইয়া আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে জাতির ইহাই ভ্রূণমূর্ত্তি জানিও। এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গই দেশ ও জাতির কলুষ ছাই করিয়া, ভারতে নবজাতির প্রতিষ্ঠা করিবে।

ব্যবহারিক জগতে একটা প্রশ্ন উঠিবে—ভারতের ব্রহ্ম-তত্ত্ব তো ভেদহীন অখণ্ড। সঙ্ঘ যদি ব্রহ্ম-তত্ত্বের প্রকাশ হয়, তবে সেখানে আবার বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্যের কথা কেন ! সে তো সেই—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥"

কিন্তু এই উদার ধর্ম্ম আমাদের রক্ষা করিল কোথা? এই ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি যেখানে স্বজাতি-বোধ জাগাইয়া বস্তুতন্ত্র, সেইখানেই তো ইহার বিরোধী ধর্ম্ম ও সভ্যতা ঠেকা খাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে। এই অমর অস্তিত্বের বিনাশ হয় নাই। এই বস্তুর সহিত একাত্ম একটা বস্তুতন্ত্র জাতি যদি কোন দিন গড়িয়া উঠিত, তবে সেই জাতি বিশ্বজয়ী হইত। আমাদের বুদ্ধি-জগতে যাহা যাহা স্বীকার্য্য, তাহা প্রাণের জগতে, দেহের জগতে সিদ্ধ করিয়া তোলার জন্য, ভারতের আত্ম-ধর্ম্ম ও সভ্যতা লইয়া একটা জাতির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য ইহার সাধনা সঙ্ঘের আশ্রয়েই চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পায়। জাতিগঠনের মন্ত্রে যে দীক্ষা লইবে, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হইয়াই বলিতে হইবে—কেবল চিত্তের প্রবৃত্তি, মনের সংস্কার লয় করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব না, সঙ্ঘ-শক্তির চরণে সর্ব্বধর্ম্ম অঞ্জলীপূর্ব্বক নিবেদন করিয়াই জাতিকে প্রবুদ্ধ করিব। ইহাতে অভিমান অহঙ্কার থাকিলে, সঙ্ঘ যে তাহার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইবে—ইহা অসম্ভব কথা নহে।

*   *
*

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌযুগে।" যুগের সাধ্য—সঙ্ঘশক্তি। ইহা—উৎসর্গযজ্ঞের সিদ্ধ মূর্ত্তি, বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ মহাশক্তি। অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভের অপেক্ষা এই তপস্যা অধিকতর কঠোর ও দুঃসাধ্য। কোন ব্যক্তির প্রয়াস এখানে কার্য্যকরী নয়; সমষ্টি-প্রাণের একযোগে তপঃ-পরায়ণতায় ইহা সিদ্ধ হয়। যে দেশে দুইজন এক হয় না, সেখানে সমষ্টিপ্রাণের এইরূপ প্রয়াস দুর্লভ বলিতে হইবে।

বলিয়াছি, আপাত কর্ম্মসিদ্ধির উদ্দেশে সংহতিবদ্ধ জীবন সঙ্ঘ নয়। এ সঙ্ঘত্ব লঘু মনের সৃষ্টি। সঙ্ঘত্ব ধর্ম্মেরই রূপ। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—মানুষের অধোগতি নিবারণ করিয়া অভ্যুত্থানের পথ প্রদর্শন করা, মানুষকে মুক্তি দেওয়া। এই অর্থেই সঙ্ঘ যুগধর্ম্ম; আর সঙ্ঘকে মূর্ত্তি দেওয়ায় যে ব্রতী, সে যুগধর্ম্মী।

ধর্ম্মের দুইটী ধারা। প্রথম—"একোদ্দেশ্যকানেকপুরুষ-প্রযত্নম্" অর্থাৎ সাধ্য এক, ফল এক, এইরূপ অব্যর্থ লক্ষ্যে বহু ব্যক্তির প্রযত্নসিদ্ধ যে কর্ম্ম তাহাই এখানে ধর্ম্ম। এই ক্ষেত্রে যদিও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করার কথা আছে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য অর্থাৎ আত্মার অভ্যুত্থান ও নিঃশ্রেয়স্। ধর্ম্মের অন্য লক্ষ্য থাকিতে পারে না।

ধর্ম্মের আর একটা যে দিক্, তাহা হইতেছে ইহা হইতে ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু অর্থাৎ ব্যষ্টির ধর্ম্ম। আমরা পূর্ব্বোক্ত সমষ্টি-ধর্ম্মই এ যুগের সাধ্য করিয়াছি। কাজেই ইহার অভিব্যক্তি—সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের ধ্যানমূর্ত্তির ঋক্ আছে, তাহা অর্ব্বাচীন যুগের নহে; ঋষিযুগেই ইহার ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল। ঋগ্বেদীয় সূক্তে আছে—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং নো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বং সংজানানাং উপাসতে ॥
সমানীব ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুহাসতি ॥

পরস্পরের সম্মিলন সঙ্ঘের সবখানি নয়; পরস্পরের অপ্রতিকূল বাক্য এখানে ঐক্যের ছন্দঃ রক্ষা করে। যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হয়, তাহা কখনও পরস্পর প্রতিকূলাচরণমূলক নহে। সকলের সঙ্কল্প এক। ক্রোধ ও লোভ সংবরণ সকলের সাধ্য এবং কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদের চিন্তা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। ব্যক্তিগত প্রিয়বস্তুর স্থান সঙ্ঘে নাই; অনাসক্তি ও উপেক্ষা দ্বারা ব্যক্তিগত স্বার্থ-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়। পরস্পরের মধ্যে সমবেদনার সাড়া সকলকে সর্ব্বসময়ে জাগাইয়া রাখে। ইহা যে খুব বড় তপস্যা তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

তারপর, ইহার প্রয়োজনের দিক্টাও দেখিবার আছে। সঙ্ঘ ধর্ম্ম বলিলেই যে প্রশ্ন বন্ধ হইবে, এমন কোন কথা নাই।

যে দেশে আত্মবিদ্রোহে জাতি ছন্নছাড়া, ব্যক্তিগত লোভ ও ক্রোধ সংহতিবদ্ধ জীবন গড়িতে প্রতিপদে বাধা দেয়, পরস্পর বিদ্বেষভাষী হইয়া ঐক্যভঙ্গ করে, সে দেশে সঙ্ঘ-সাধনার প্রয়োজন যে কত অধিক তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ, এই পরাধীন দেশে সঙ্ঘ-সাধনার ভিত্তি দৃঢ় করিতে পারিলে, মুক্তির পথই প্রশস্ত হইবে। মহাভারতে, সঙ্ঘসাধনার অনুকূলে এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :—

> অর্থাশ্চৈবাধিগম্যন্তে সঙ্ঘাতবলপৌরুষৈঃ।
> বাহ্যাশ্চ মৈত্রীং কুর্ব্বন্তি তেষু সংঘাতবৃত্তিষু।
> জ্ঞানবৃদ্ধাঃ প্রশংসন্তি শুশ্রূষন্তঃ পরস্পরম্।
> বিনিবৃত্তাভি সন্ধানঃ সুখমেধন্তি সর্ব্বশঃ॥

সঙ্ঘের বল ও পৌরুষ দ্বারা অসংখ্য প্রকার কার্য্য সিদ্ধ হয়। বাহিরের লোকও সঙ্ঘের সহিত মিত্রতা করিয়া থাকে। এই জন্য সঙ্ঘ লোকচরিত্রের বিবেচনাকুশল হইয়া পরস্পর সরল ব্যবহার দ্বারা সঙ্ঘকে অটুট করিবে, তাহারা সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবে।

সঙ্ঘের প্রয়োজন অনুভূতিগম্য হইলেও, সঙ্ঘের জন্য যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতে আমরা সহজে রাজী হইতে পারি না এবং এই জন্য সম্ভবতঃ সঙ্ঘসাধনার আসল তত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া আমরা আপাতকর্ম্মসিদ্ধির অনুকূলে ঐক্যবদ্ধ জীবনের ভিত্তি না গড়িয়াই অভীষ্টসিদ্ধির পথে আগাইয়া যাই। মোহবশতঃ, একত্র কয়েকজনের সম্মিলিত জীবনই আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রাণ বলিয়া ভ্রম হয়; কার্য্যকালে ঐক্যবল

কতখানি তাহা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা পুনঃ পুনঃ একই প্রকার ভুল করি। তাহাতে জাতির সঞ্চিত শক্তির অপচয় হয়; কোথাও ঐক্যের বেদী গড়িয়া না উঠায়, আমরা বর্ত্তমানেও যেমন নাকাল হই, তেমনি ভবিষ্যতের আশাও কিছু থাকে না—সঙ্ঘের প্রয়োজন এই দিক্ দিয়াও দেখিবার আছে।

দেশের অবস্থায় এইরূপ সঙ্ঘসাধনার অবকাশ আছে কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এই বিচারের পূর্ব্বে, যদি প্রশ্ন করা যায়—এই দেশটা কাহার? আজ আর ইহার উত্তর নাই। হিন্দুর দেশও বলা চলে না; কেন না, হিন্দুর সংখ্যা অধিক হইলেও, সকল হিন্দুর মনোভাব সমান নহে। গুরু নানক হিন্দু ছিলেন, গুরু গোবিন্দ হিন্দু সাধনারই প্রতিভূ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহা হিন্দুজাতিরই মর্ম্ম-কথা। কিন্তু আজ শিখজাতির স্বার্থ হিন্দু হইতে স্বতন্ত্র। বর্ণাশ্রমের প্যাঁচে পড়িয়া এক তৃতীয়াংশ লোক অস্পৃশ্য; ইহারা হিন্দু হইলেও, হিন্দুপ্রধানগণের সহিত ইহাদের আর ঐক্য নাই। অধিক কি, সেদিন বিলাতের গোলকধাঁধায় ভারতের হিন্দুজাতি অতি নগণ্যরূপেই প্রতীয়মান হইয়াছে—এমন হইবে কেহ ভাবিতে পারেন নাই। অন্ধতাবশতঃই মানুষ নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়। হিন্দুর এই দুর্দ্দশা সঙ্ঘশক্তি উপেক্ষা করায় সম্ভব হইয়াছে। হিন্দু নিঃস্বার্থ হইয়া সঙ্ঘ গড়ে নাই, ব্যক্তি-প্রভাবের বলে আদর্শসিদ্ধির অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। জাতির ধর্ম্ম ও আদর্শের মূলে সঙ্ঘশক্তি না থাকায় আজ তাহার

কুফল হাতে হাতে ফলিয়াছে—নিজের জন্মভূমিকে আজ নিজের বলার অধিকার হারাইয়াছে।

এই অধিকারবাদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রয়াসের মধ্যে সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সঙ্ঘ গড়িতে হইলে, ব্যক্তি-ধর্ম্ম অটুট রাখিয়া চলা যায় না। "সজাতীয়ানাং বিজাতীয়ানাঞ্চ জন্তূনাং বৃন্দে"—সঙ্ঘসৃষ্টি হয়। এক ধাতু বা প্রকৃতির লোক এই হেতু এই ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। কাজেই কোন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য থাকিতে সঙ্ঘে সংঘাত বাড়িয়া থাকে, সংহতি হয় না। সঙ্ঘত্বের জন্য এই হেতু প্রত্যেককেই অহঙ্কার ত্যাগ করিতে হয়।

ইহা একদিনের কাজ নয়। ইহা ব্যতীত, সঙ্ঘ ক্রমবর্দ্ধনশীল হওয়ায়, নিত্য নূতন নূতন লোক আসিয়া সমবেত হয়। ব্যক্তিগত অশুদ্ধি এই ক্ষেত্রে থাকিলে ধারাবাহিক জটিলতারই সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক নূতন ব্যক্তির ক্রোধ, ভয়, পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার স্বভাব, দ্বন্দ্ব, নিগ্রহ, আসক্তি, এমন কি ব্যাভিচার দোষও সঙ্ঘকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। ইহা সঙ্ঘের দৃঢ় সুনীতির সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে নিরসিত না হইলে দলভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সঙ্ঘও শত্রু কর্ত্তৃক বিজিত হয়। এই হেতু দলপতিকে এবং সঙ্ঘ-চক্রকে সর্ব্বদাই একযোগে এই সকলের প্রতিবিধানকল্পে সতত সদাচার-পরায়ণ হইয়া থাকিতে হয়। যে নীতি ও ব্যবস্থা সঙ্ঘকে এইরূপ জাগ্রত রাখে, তাহা জাতীয়তামূলক হইলে, জাতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যও তাহার দ্বারা রক্ষা পায়। অধিকন্তু দেশহৃদয় সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত

হওয়ায়, অন্তর্বিদ্রোহেও সঙ্ঘকে শক্তিহীন হইতে হয় না। যে দেশ ও যে জাতির মধ্যে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা, সেই দেশ ও জাতির শাস্ত্র ও ধর্ম্মের সহিত নাড়ীর সংযোগসূত্র অব্যাহত থাকায়, সঙ্ঘই এইরূপ জাতীয়তারক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এই দিক্ দিয়া সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন অভিনিবেশসহকারে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সঙ্ঘ ভারতের ধর্ম্মকেই মূর্ত্ত করিবে—একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা, উৎসর্গ ও পরিচর্য্যাগুণে উহাকে কালসঞ্চিত আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত ও বিশোধিত করিয়া, জাতির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রিয়াময় করিয়া তুলিবে। ধর্ম্মসংরক্ষণ সঙ্ঘের কর্ম্ম; তাই সঙ্ঘ দেবব্রতী, ভাগবত। সঙ্ঘ-শক্তি বিনা গণধর্ম্ম রক্ষা পাইবে না, গণধর্ম্মের জাগরণ না ঘটিলে জাতির গৌরবরক্ষা সম্ভব হয় না। এই সকল কারণে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সঙ্ঘসৃষ্টির প্রয়োজন কতখানি, তাহা অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

বলিয়াছি, সঙ্ঘের ধর্ম্ম ইহ-বিমুখ নয়; কেন না, পৃথিবীর বুকে ধর্ম্মের শাশ্বত বীর্য্য সুরক্ষিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। তাহার জন্য সঙ্ঘের ধনবল, বাহুবল, বিদ্যাবল ও শাস্ত্রবল চাই। মায়াবাদ এইজন্য সঙ্ঘজীবনে প্রশ্রয় পাইতে পারে না। মায়াবাদে এই সত্যের অনুষ্ঠান কর্ম্মক্ষয় হেতু বলিয়া গণ্য হইবে; সঙ্ঘের পক্ষে ইহা মিথ্যাচার। অন্তরের লক্ষ্য এক দিকে, প্রাণ অন্য দিকে—এইরূপ হইলে জীবন পঙ্গু হয়। ভারত এই পাপেই নপুংসক হইয়াছে। পরন্তু গীতার মায়াবাদ দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া যে ভাগবত-প্রাপ্তির নির্দ্দেশ

দিয়াছে, তাহা শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ আশ্রয়গ্রহণের অব্যর্থ সঙ্কেত। এই আশ্রয়তত্ত্ব লয়ের বস্তু নয়—অখণ্ড সৎ—যিনি যুগে যুগে "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" কহিয়াছেন। তাই মোক্ষের প্রকৃত অর্থ ভাগবত জীবন—এই অর্থেই লক্ষ্য স্থির করিয়া সঙ্ঘব্রতী আশ্রয়-বস্তুতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিবে। এই বস্তু শুধু মন্ত্র নয়, জড় বিগ্রহ নয়, জীবন্ত মানুষ অথবা জীবন্ত সঙ্ঘচক্র। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা হৃদয়ে দৃঢ় না হইলে সঙ্ঘের দীক্ষা সহজসাধ্য হয় না।

ভগবানের ডাক যাহার কানে পৌঁছায়, সেই এই মহাব্রত গ্রহণ করে। চিহ্নিত নারী পুরুষই এই পথের প্রথম যাত্রী। যাহাদের মর্ম্মে ভগবানের এই অনাহত পাঞ্চজন্যধ্বনি স্পর্শ করে, তাহাদের অগস্ত্যযাত্রাই করিতে হয়। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সম্বন্ধ, সমস্তের বিসর্জ্জনে মরণের মতই এ পথ ভীষণ দুর্গম বলিয়া প্রতীত হয়। এই স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিয়া বিরাটের মধ্যে নূতন জন্ম লইতে হয়। মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, রূপাশ্রয়ে বৈষ্ণব সাধনায় যেমন পর পর দীক্ষা, গোত্রান্তর ও জন্মান্তর এইরূপ স্তরভেদে ব্যক্তিগত সম্বন্ধসিদ্ধির ইঙ্গিত আছে, সঙ্ঘ-সাধনায় একটা সমষ্টীভূত সম্বন্ধ-চক্র আশ্রয় করিয়া এই সিদ্ধিই বস্তুগত ও জাতিগত হইয়া দেখা দেয়, সবখানিই এখানে জীবন্ত প্রাণবস্তু হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই বিদ্যুৎ-প্রাণ নারীপুরুষের ঐক্য-মূর্ত্তিই ভারতজাতির দিব্য বীর্য্য।

গুরুদত্ত সিদ্ধমন্ত্র—ঐক্যের মন্ত্র। গুরুর মর্ম্মই ঐক্যের মর্ম্ম। সুরের সহিত কণ্ঠ মিলাইতে হইলে যেমন উভয়ের লয়ে ইহা

সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ হিয়ায় হিয়ায় মিলাইয়াই ঐক্যবস্তুলাভ হয়। এই মিলনের মর্ম্ম আজ কয়জন বুঝে, জানে? আর বুঝে না, জানে না বলিয়াই তো এ জাতি নিদারুণ অনৈক্যে বীর্য্যহীন প্রাণহীন হইয়া মরিতেই বসিয়াছে।

মন্ত্রধ্বনি নূতন নহে; ইহা চিরযুগের আহ্বান। আজ মন্ত্র জীবনে সিদ্ধ করার দিন আসিয়াছে। ভারতের ঐক্য-বল সুসিদ্ধ করিবার জন্য আজ সঙ্ঘশক্তিই সাধ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। রামদাস ও শিবাজীর মধ্যে ঐক্যের সুর ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, তাই মহারাষ্ট্রে একটা জাতিসৃষ্টির অঙ্কুর দেখি। ভারতের ধর্ম্মজগতে সেদিন চক্ষের সম্মুখে যে যুগান্তরের সূচনা দেখা দিল, তাহা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ঐক্যবদ্ধ অভিব্যক্তি। ঐক্যের জন্য যত ত্যাগ, যত তপস্যা, এমন আর কিছুতে নয়; কেন না, ইহাই যে ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের সিদ্ধান্ত স্বরূপ হইবে। ভারতে যেখানে ইহা সার্থক হইবে, সেইখানেই ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের গর্ব্ব এই অপার্থিব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। এই ঐক্যের মূলে তাই সাধনার মহাশক্তিই নিহিত; আদর্শ বা উদ্দেশ্য নহে। ইহারা গৌণ কারণ; মুখ্য নীতি—মন্ত্রে অর্থাৎ তত্ত্বে আত্মলয়। লয়ের পর ঐক্যের ভাস্বর মূর্ত্তি, অমোঘ বীর্য্য প্রকাশ পাইবে। তত্ত্ব সিদ্ধ; ঐক্যবস্তুই আজ সাধ্য। প্রবুদ্ধ দেশসন্তানের দল কি আজ এই পথেই অগ্রসর হইবে না?

ভারতের মর্ম্মতন্ত্রে যে নির্দ্দেশবাণী অনাহত ঝঙ্কার তুলে, তাহা ঋষির কণ্ঠোচ্চারিত ঋকের উদ্‌গান প্রতিধ্বনিত করিয়াই বলি—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্ গচ্ছতি ন মনঃ"

—ইন্দ্রিয়বৃত্তি দিয়া শুনিতে, দেখিতে, স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না; বাক্য ও মনের উহা বাহিরে—গুরুর মর্ম্মে মর্ম্ম মিশাইয়া সে অমোঘ আদেশ লাভ করিতে হয়। এই আদেশ শক্তিময়; জীবন তাই অজেয় হইয়া উঠে। এই বীর সন্তান-বৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যখন দাঁড়ায় তখনই দেশ ও জাতি সার্থক হয়, মানুষ কৃতার্থ হয়—ভারতে ইহার অন্যথা হইবে না।

কিন্তু এই "একস্য ভাবঃ"—তাহা যদি খাঁটি যথার্থ রূপে আমাদের আয়ত্ত না হয়, আমরা খণ্ড বিক্ষিপ্ত জীবনসমষ্টিই গড়িয়া তুলিব। ইহাও যে সিদ্ধির অন্তরায়। ঐক্যের নামে অহঙ্কার প্রশ্রয় পায় বলিয়াই ভারতে গুরুবাদের অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা। গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া মানুষ দেবতার সাথে ঐক্য পায়, মুক্তি পায়। মন্ত্র ও গুরুর লয় লইয়া জীব-স্বভাব অপার্থিব রসায়ণে পরিণত করে; এই রস ঘন হইয়া যে বিগ্রহসৃষ্টি হয়, তাহাই অদ্বয় জাতি-মূর্ত্তি। ভারতে তাই দেবজাতির স্বপ্ন কল্পবিধৃত মহাসত্য। ইহা দুর্ব্বোধ্য দুঃসাধ্য মনে হইলেও, আমরা তরুণকে বলি—"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্।" অল্পমাত্র সাধনায়ও ইহার অমোঘ বীর্য্যের পরিচয় পাইবে, তখন আপন দৃষ্টি দিয়াই বুঝিবে—ইহাই সনাতন পন্থা। —নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

এ যাত্রা অবশ্যই নিরাপদ্ নহে। আসক্তির বাঁধন ছিঁড়িতে কাতারে কাতারে ভীড় করিয়া মানুষ একদিন সঙ্ঘ-চক্রে যোগদান করিবে ও ইহাকে সুপ্রসারিত করিয়া তুলিবে; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিলে তিলে আত্মদান করিয়াই একদল মানুষকে চলিতে

হইবে। দধীচির অস্থি দিয়া যেমন বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তেমনই সঙ্ঘব্রতী নারীপুরুষকেও বিন্দু বিন্দু রক্তের অর্ঘ্য ঢালিয়াই বুভুক্ষু দেশমাতৃকার খর্পর পূর্ণ করিতে হইবে। দেশের রুদ্র নীতি বীভৎস কাপালিক বেশে যেখানে আত্মঘাতী হয়, বিজাতীয় রক্তধারায় ধরণী কলুষিত করে, সেখানে ভক্ত আপন হৃৎপিণ্ড উপাড়িয়া, অন্তর ছিঁড়িয়া শ্রদ্ধার্ঘ্যদানে ভারতীর মন্দির মহিমান্বিত করিয়া তুলিবে। ইহাতে শক্তিরই জাগরণ হয়; জাতির প্রাণে বিদ্যুৎপ্রবাহ নামিয়া আসে। ভারতজাতির সত্যই তাহা অভ্যুত্থান। কোন বাধায় এ জাতির মুক্তি আর তখন বাঁধন মানিবে না।

অন্তরায় বহু; কিন্তু সে অন্তরায়ের সম্ভাবনায় বিচলিত হইলে চলিবে না। বিমানে যন্ত্রচালনা করিয়া মানুষের যে বিচরণ-প্রচেষ্টা তাহাও তো বিঘ্নহীন নহে। ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীর মর্ম্মভেদের প্রয়াস তাহা কি অনায়াস-সাধ্য? সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের সীমানির্দ্ধারণের সাধনাও দুরধিগম্য—ইহা কে না জানে! তেমনই ঐক্য ও প্রেমের অমৃত আবিষ্কার করিতে সাধকের এই মরণাভিযান ঘোরতর বিপজ্জনক, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। ভারতের কত উদার, সরল, বীর পুত্র-কন্যা এই পথে ব্যর্থ হইয়াছে, আত্মঘাতী হইয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই; প্রতিপদে প্রবঞ্চনার কষাঘাতে কত মানুষের চক্ষে রুধির ঝরিয়াছে, তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছে? —মর্ম্ম ঢালিয়াই মর্ম্মলাভ হয়, প্রাণ দিয়াই প্রাণের সন্ধান মিলে। এ পথে যে বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, ছলনা, তাহা পথেরই লক্ষণ; এই

সব বিদীর্ণ করিয়া যদি কোথাও হিয়ায় হিয়ায় এক হয়, দেশ ও জাতি ধন্য হইবে। ঐক্য ও প্রেমের সাধনায় মানুষ মৃত্যুঞ্জয়ী হয়, শিব হয়। এত বড় হইয়া কাজ নাই—ইহা ভীরুর উক্তি। উৎসর্গের প্রাণ সচেতন হইয়াই আজ সাধনার বেদী তীর্থময় করিয়া তুলিবে; নেশাখোরের মত পরপ্রভাবাবিষ্ট জীবনের দান কোন দিন বৃহৎ কার্য্য সিদ্ধ করে না।

"গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য না মিলে এক"—ইহা সত্য কথা। গুরুর অহমিকা—এ পথের ভীষণ বাধা। ইহার চেয়ে গুরুতর অন্তরায়—অসংখ্য গুরুকে কেন্দ্র করিয়া ঐক্যবদ্ধ সমষ্টিগুলি আত্মবৈশিষ্ট্যে পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া ভেদের মাত্রাই বাড়ায়। ব্যষ্টিজীবনের অনৈক্য আকারেও যেমন ক্ষুদ্র, তাহার আচরণও তদ্রূপ নগণ্য; কিন্তু সমষ্টিবদ্ধ জীবন পরস্পর ঐক্যহীন হইলে কি শোচনীয় মূর্ত্তি ধরে, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়।

কিন্তু ঐক্যসিদ্ধ সংহতি বজ্রের ন্যায় ক্ষিপ্র ও অপরিসীম বীর্য্যশালী। দ্বেষবিদ্বেষ-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ সঙ্ঘ অনৈক্যের অন্ধকার বৃদ্ধি করে না, জাতির সুপ্ত সংহতিবোধই জাগাইয়া তুলে। আমরা বিকৃতির দিক্‌টাই সত্যের স্বরূপ বোধে ইহার মধ্যে বিঘ্নসৃজনের বীজ সন্দর্শন করি। ঐক্যবস্তু মূলতঃ অমোঘ শক্তি-সম্পন্ন। ইহা সিদ্ধ হওয়ার পথে যে বিকৃত গুরুবাদ, যে অহংকৃত-সমষ্টি, তাহা ঐক্যের স্বরূপ নহে। এইজন্য স্বল্প মাত্র ধর্ম্মসাধনা হইলেও যেমন তাহা মহানিষ্ট দূর করে, তদ্রূপ সাধ্যমত ঐক্যসাধনায়ও আমরা দেশ ও জাতিকে স্পর্দ্ধান্বিত করিয়া তুলিব। দেশের সর্ব্বত্র এই ঐক্যের সাধনাই মূর্ত্ত হউক।

ভারতের সনাতন কীর্ত্তি মানুষের দম্ভ ও অহঙ্কারে চিরমলিন থাকিবে না। ভারতের যে সাম্রাজ্যলিপ্সা তাহার মূলে আছে এই ধর্ম্মস্থাপনের উদ্দেশ্য। আমরা তাই ভারতধর্ম্মীদের বলি —"উত্তিষ্ঠতঃ, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত"। এই অপার্থিব ঐক্যবদ্ধ প্রাণ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াও—স্বর্গরাজ্য তোমার সম্মুখে।

* *
*

নবম পরিচ্ছেদ

আমরা এপর্য্যন্ত জীবনের দুইটী পথ আবিষ্কার করিয়াছি অথবা স্বভাব-সিদ্ধ রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। একটী সহজ জীবনের পথ—আহার-নিদ্রা-মৈথুননিরত প্রাকৃত জীবন; অন্যটী ইহা হইতে নিবৃত্ত, উর্দ্ধমুখী, তুরীয়ে নিজেকে ফুরাইয়া দিয়াছে। একদিকে মৃত্যু আমাদের অস্তিত্ব নিঃশেষে মুছিয়া দেয়; অন্যদিকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করি—মহানির্ব্বাণ, মহাসমাধি নামে উহা অভিহিত। এই শেষ পথে অসাধারণ যাঁরা তাঁরাই চলেন, পুরুষার্থের পরিচয় সংসারী জীবের কাছে চমৎকার বলিয়া মনে হয়, চিরদিন তাই ইহারা সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য দানে এই উত্তর-যাত্রীদের পূজা দিয়া থাকে।

মরণের পর যদি জীবনে বিশ্বাস কর, তবে বার বার এই পৃথিবীতেই মানুষের জন্ম হয়, মহাসমাধির পর যদি পুনঃ চেতনার উন্মেষ সম্ভব বিবেচনা কর, তবে সিদ্ধ মহাপুরুষের চক্ষে এই পৃথিবীই আবার ভাসিয়া উঠে। সৃষ্টি যেন ঋজুগতিহীন আবর্ত্ত; দিনের পর দিন, সম্বৎসর, যুগযুগান্তর, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, এমন চতুর্যুগের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব শুনা যায়। এমন করিয়া আটাশ কলিযুগ নাকি আনাগোনা করিয়াছে; যাহা আজ অনাগত মনে হয়, তাহা অতি অতীতের পুনঃপ্রবেশ—ইহা যে ব্রহ্ম-চক্র,

কেবল পরমায়ুঃর তালে সমের বিরাম আছে বলিয়া গতানু-গতিককে নূতন বলিয়া বরণ করি। আমরা কলুর বলদ ভিন্ন বুঝি অন্য কিছু নই।

ভারতের সত্তা এই ব্রহ্মচক্র বিদীর্ণ করিতে চাহে, ভারতের জীবনেতিহাসে ইহার পরিচয় আছে। কালের নীতি ভারত চূড়ান্ত করিয়াই বিশ্লেষণ করিতে চাহিয়াছে। ভারতের সত্তা সত্যই বিদ্রোহী। এই বিদ্রোহ মানুষের স্বার্থ লুট করিবার জন্য নহে, মৃত্যুর অধিকার হইতে জীবনকে নিত্য জয়ী করিবার জন্য। ভারতের যে অধ্যাত্মানুভূতি তাহা মলিন বুদ্ধি-সত্তায় যতই বিকৃত আকার ধারণ করুক, মাজিয়া ঘষিয়া দেখার যাহার সাধ্য হইয়াছে, সে তখনই ইহার মর্ম্মকথা শ্রুতিগোচর করিয়াছে। ভারতের জ্ঞান কর্ম্মে জলাঞ্জলী দিয়া অভিযানে ছুটিলেও—গৌরবের কথা, বাংলায় এই নূতন তন্ত্রের ঋক্‌ উচ্চারিত হইয়াছে; বাঙ্গালী মৃত্যুর পথ, সমাধি নির্ব্বাণের মোহ ছাড়িয়া, জীবনকে অমৃতময় করার তৃতীয় পন্থারই সন্ধান দিয়াছে। যদি আবর্ত্তমগ্ন জীবন ছাড়িয়া সাধ্যসিদ্ধির জন্য গতির স্পর্দ্ধা কাহারও জাগে, তবে তাহাকে বাংলার নব তন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইবে।

সে তন্ত্রের মন্ত্র—"আত্মসমর্পণ।" আত্মার দীক্ষা-সমাপনের জন্য জীবনবৃত্তির তর্পণ প্রয়োজন, একথা আমার বহুপূর্ব্বে বিশদ-রূপেই বিবৃত করিয়াছি—আমরা আজ উৎসর্গীকৃত জীবন ভিত্তি করিয়া যে নব নির্ম্মাণের স্বপ্ন দেখি, তাহাই বলিব।

কল্পের পরিবর্ত্তন না হইলে অতীতের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমন অনিবার্য্য। উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যায়, বৈদিক যুগের আদর্শ

আবার ঘুরিয়া আসিতে চায়। সে যুগের স্বেচ্ছাচারতন্ত্র আজ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে আদর্শরূপে দেখা দিয়াছে, ভারত প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে নূতনের মহিমায় দিশেহারা হইল বলিয়া! পুত্র ও ভর্ত্তার সম্মুখেই শ্বেতকেতুর জননী অন্যের রতিসুখ দানে উদ্যত হইয়াছিল, এ চিত্র ভারতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা—মানুষের স্বেচ্ছাচার তন্ত্র ইহার উপরে কোথাও স্থান পাইবে কি না সন্দেহ। ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, বলশেভিক রাশিয়ায় নারী পুরুষের স্বেচ্ছাতন্ত্রমূলক মিলনাদর্শ দেখিয়া ভারতের চিত্ত উৎফুল্ল হওয়ার কারণ নাই—এ রস, এ ভঙ্গী ভারতের বিবর্ত্তন-ধারায় একদিন প্রবল মূর্ত্তি লইয়া প্রকট হইয়াছিল। তার পর ভারত নিয়মতন্ত্রে আপনাকে বাঁধিতে গিয়া, সমাজ-বর্ণ-আশ্রম গড়িয়াছে, চাতুর্ব্বর্ণ্যগঠনের বিরুদ্ধবাদীর প্রতি আদর্শনির্ম্মাণের দায়ে কি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে! ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে চতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়া অভাগবত রূপে একদলকে কত দীর্ঘ দিন অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—এই অস্পৃশ্য চণ্ডাল ও শ্বপচ জাতিকে লোকালয়ে বাস করিতে দেওয়া হয় নাই, পশুপালন ও কৃষিব্যবসায়ে পাছে তাহারা সমৃদ্ধ হয়, এই জন্যই তাহাদের গর্দ্দভ ও কুক্কুর ব্যতীত অন্য পশু পালনের অধিকার দেওয়া হয় নাই, তাহাদের স্পর্শদোষ থাকায় লোকসমাজে কোনরূপ উপজীবিকার উপায় তাহাদের ছিল না। মৃতবস্ত্রে তাহারা লজ্জা নিবারণ করিত, ভগ্ন মৃতভাণ্ডে আহার করিত। মানুষের প্রতি এই অত্যাচার ভারতেই হইয়াছে, আজ সে চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রভাব

কোথায়? চণ্ডালজাতি বিচারকের আসনে বসিলে, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও আজ কপালে হাত দিয়া সম্মান দেখাইতে হয়,—সবই প্রকৃতির প্রতিশোধ, প্রকৃতির হাতে মানুষের চিরযুগ এই বানর-নাচ প্রত্যক্ষ করিয়াও আমাদের চৈতন্য হইল না! বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডেও প্রকৃতির আবর্ত্তনীতি প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, কর্ম্মে ব্যষ্টির অহঙ্কার সমাজে যুগে যুগে বিপ্লব সৃজন করিয়াছে, জ্ঞানে তুরীয় চৈতন্যযুক্ত হইয়া মানুষ জীবন হারাইয়াছে—যে কেন্দ্রচৈতন্যে মর্ত্তপ্রাণ বিধৃত, তাহা প্রকৃতি-তত্ত্ব হইতে মুক্তি পায় নাই; ভারতের অনুভূতিক্ষেত্রে অপ্রাপ্তির বেদনা বাজিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতির বাহিরে সে ঝাঁপ দেয় নাই।

আমরা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম গড়িয়াছি, কিন্তু ঊর্দ্ধাশ্রমের সন্ধান পাই নাই। আমরা সাম্, ঋক্ আদি চতুর্ব্বেদের মর্ম্ম পাইয়াছি, বেদাতীত হই নাই। আমরা হঠযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগের সাধনা করিয়াছি; কিন্তু আত্মসমর্পণযোগের মধ্য দিয়া, সিদ্ধযোগের সূত্র ধরিতে পারি নাই। আমরা প্রকাশ, চৈতন্য, স্বরূপ ও আনন্দ, ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি গড়িয়াছি; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাতীত পরমানন্দের রূপ লাভ করি নাই। নির্ম্মাণের এই নিগূঢ় রহস্য ধরিতে পারি নাই বলিয়াই পৃথিবীর মৃত্যুবিজড়িত, চর্ব্বিত-চর্ব্বণনীতি উপাদেয় বোধে গ্রহণ করি; অন্তর্দৃষ্টিহারা—শক্তির অব্যাহত তরঙ্গের আঘাতে নড়িতে গিয়া ঘুরিয়া মরি; বাঁধন-ছেঁড়ার যে উদ্দাম গতি তাহা আর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

একান্তর দিব্যযুগের অন্তে কল্পান্তরের ভবিষ্যদ্বাণী হয়তো অসংখ্যবার সফল হইবে; কিন্তু সে কি নূতন কল্প! "পরকালে অক্ষয়-ফলপ্রদ-পুণ্য, ব্রাহ্মণগণানুষ্ঠেয় চারি প্রকার আশ্রমের ক্রিয়া-কলাপ" প্রকাশ করিয়াই ভারতের আর্য্যসভ্যতা স্তব্ধ হইল। ভবিষ্যৎ যে আর্ত্তকণ্ঠে এখনও প্রশ্ন করে "ততঃ কিম্"—সনাতন হিন্দুসমাজ নিরুত্তর। কাজেই নূতন বেশে পুরাতন আসিয়াই আকুলতার আগুন নিভাইয়া যায়, কিন্তু মানবজীবনের সাফল্য কোথায়?

ভারতের সন্ন্যাস এই অনাগতের সন্ধানে অভিযান করিয়াছিল। মাথার কেশ, নখ, শ্মশ্রু, ফেলিয়া দিয়া, দণ্ড কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র হাতে ভারতের সন্ন্যাসী যে দিন মহাযাত্রা করিল, মর্ত্ত্যজীবের সে দিন উৎসাহের সীমা থাকে নাই—কিন্তু কত যুগ, যুগান্তর অতিবাহিত হইল, অমৃতভাণ্ড লইয়া তাহারা তো আর ফিরিল না, আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই রহিলাম!

তাই নূতনের স্বপ্ন সার্থক করার অগ্নিময় আকাঙ্ক্ষা আবার আজ জাগিয়া উঠে। আত্মসমর্পণ সিদ্ধ করার ভিতর দিয়া, জীবনের নব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অবধারিত জানিয়াই আমরা নূতন আশ্রমের ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করি।

ব্যষ্টি-আত্মা যখন জীবনবৃত্তির পরিপূর্ণ তর্পণে বিন্দুর সহিত যুক্তি পায়, তখন তার কল্পের রূপান্তর লক্ষ্যে পড়ে; নূতন সৃজনের রসকেন্দ্র অধিকার করার দুর্জ্জয় বীর্য্য হুঙ্কার দিয়া উঠে। এই অভিনব ক্ষেত্র রচনা আপনাকে তলাইয়া, ডুবাইয়া, ইষ্টের সহিত নিত্যসম্বন্ধসৃষ্টির রসেই শশীকলার ন্যায় দিন দিন বিস্তৃত

আকার পরিগ্রহ করে ; কেননা বিন্দুর মধ্যে যে বিরাটের সম্ভাবনা ছিল, তাহা আত্মার রসায়ণে রূপের জগৎ গড়িয়া তুলে। ইহার স্থিতিক্ষেত্র এ মর্ত্ত্য নহে ; সে নূতন ক্ষেত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান মিশিয়া এক হইয়াছে, তপস্যা বিরাম পাইয়াছে. ত্যাগ ও ভোগের দ্বন্দ্বরেখায় জীবন খণ্ডিত নাই ; সেখানে নিত্য সিদ্ধি ও ঋদ্ধির মহালীলা চলে, মানুষের প্রবৃত্তি লয় পাইয়া ঈশ্বরকামই সার্থক হয়, তাই ইহা সিদ্ধযোগের কেন্দ্র। অতীত ও বর্ত্তমানের আবর্ত্তন ভেদ করিয়া প্রবৃত্তির মৌলিক রূপান্তর এই নূতন কল্প নির্ম্মাণ করিবে—সঙ্ঘাশ্রমী।

সে একটা নূতন ক্ষেত্র। সেখানে মানুষ নিজের নিজের সুবিধামত অবস্থা গড়িয়া লইতে পারে না। সেখানে তাহার বাসনা জীবন-যন্ত্রের শক্তি নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা সবখানিকে চালাইয়া লয় ; অবস্থার বিপরীতেই জীবন ছুটিয়া চলে, দুঃখ কষ্টে নিজেই কাঁদিয়া সারা হয়, পথের বাধা তারা হইতে পারে না।

জীবনের এই নূতন বেগ যাহাদের জীবনে দেখা দেয়, তাহাদের বাহিরটা শুকাইয়া যায়। যাহারা এ প্রবাহে ঝাঁপ দেয় নাই, তাহারা বরং থাকে ভাল ; অন্তর বাহির তাহাদের দুমুখো নয়, ভিতরটা ঘুমাইয়া থাকে—বাহিরের জাগরণে একটা স্ফূর্ত্তি আছে, সুখও আছে।

ভিতরে জাগরণের জোয়ার, বাহিরের প্রবাহ কিন্তু ভিন্নমুখী—আবর্ত্ত তাই স্বাভাবিক। যখন জীবন-যন্ত্র সব এক সুরে বাজিবে, তখনই স্বাস্থ্য, তখনই আনন্দ, তখনই সৌন্দর্য্য ; তার আগে, বাহিরটা পাতা-ঝরা গাছের মত শ্রীহীন হইয়া থাকে।

অন্তরে বসন্তের স্পর্শ বাহিরে প্রকাশ পাইবে। যে কয়দিন বিলম্ব সে কয়দিন সাধকের বহির্জীবন নিজের কাছেই যেমন খাপ্‌ছাড়া, অন্যের কাছেও তেমনই উদ্দেশ্যহীন বলিয়া মনে হয়।

অন্তরের ভাগবত-সম্বন্ধ স্থির হইলে যে শক্তি জীবন আশ্রয় করে, সে বাহিরের বাধা মানে না, হিসাব করিয়া চলে না; যেখানে জয়ের আশা সেখানে পরাজয়ের লাঞ্ছনা আনিয়া দেয়, লাভের জায়গায় ক্ষতির সমুদ্র সৃষ্টি করে। বাহির চায় বিমুখ হইতে, কিন্তু অন্তরের যুক্তি তো টুটে না; তাই এই আবর্ত্ত ভেদ করিয়াই অন্তরে বাহিরে সন্ধি হয়। এইরূপে ঈশ্বর-সম্বন্ধে মানুষের সবখানি পূর্ণ হয়, তাহাই সিদ্ধ রূপ।

এই সম্বন্ধ-তত্ত্বের সন্ধান কেহ চেষ্টা করিয়া করে না। ইহা কল্প-বিধৃত; তাই সহজেই উপস্থিত হয়। যখন তাহা পরশ দেয় তখনই নূতন শক্তির অভ্যুদয়; সে শক্তি চায় না, চায় আস্বাদ—পৃথিবীর কোন রস নয়, স্বর্গের অমৃত। দিব্যশক্তির লক্ষ্য তো মৃত্যু নয়, মুক্তি নয়; লক্ষ্য অমৃত তত্ত্ব—সে মৃত্যুকে বিদীর্ণ করিয়াই চলে। এই শক্তির সঙ্গে যাহার সবখানি ছুটিতে পারে, সেই সিদ্ধ হয়। নিত্য সম্বন্ধ-তত্ত্বের মানুষ যারা, তারাই দিগ্বিজয়ী হয়।

এই পথে গতি কোন দিন স্তব্ধ হয় না, গতির বেগে শরীর মন ছিঁড়িয়া যায়। ঈশ্বরের পথে যাত্রা দুর্গম; কেন না কখন কখন সূঁচের ছিদ্র দিয়া সবখানিকে গলাইয়া পার হইতে হয়। এক কণা সংশয় থাকিলে আর চলার উপায় নাই—চালুনীর ছেঁদা দেখিয়া যদি তার ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া পার হওয়া বিচিত্র

মনে হয়, অমনি আটকাইয়া যাইবে। কোথায় কার ভিতর দিয়া চলিয়াছি; জয় কি পরাজয়, লাভ কি ক্ষতি, সুখ কি দুঃখ; এ সব দেখিলে চক্ষু আঁধার হয়—দেখাও বিধি নয়, লক্ষ্য রাখিতে হয় শক্তির উপর। নিজের চাওয়াতেও বিপদ্ আছে: এই দ্বন্দ্বময় জীবন এমন ক্ষুরধার পথে চলিবে কিনা সংশয় আসিতে পারে। শক্তির বিদ্যুৎ পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়া ঘরে ঢুকে,—তাই যে শক্তিকে ষোল আনা আশ্রয় করে তাহার পথের বিচার থাকে না।

যেটা কায়া সেটা আজ ছায়া হইয়া আছে; আর ছায়াটার উপর কায়া-বোধে আমাদের মহাভ্রান্তি সৃষ্টি করে। দেহ-চেতনা আমাদের কায়া নয়, ঈশ্বরতত্ত্বের সম্বন্ধই আমাদের রূপ; তাই এমন হইবে যে বস্তু হইবে সম্বন্ধ-তত্ত্ব—কায়া ছায়ার ন্যায় তাহাকে অনুসরণ করিবে। তাই পথের বাধা এ ক্ষেত্রে অর্থহীন।

যার বাসনা খসিয়াছে, সব আসক্তির মূল নির্ম্মূল হইয়াছে, স্বাস্থ্য-জ্ঞান হারাইয়াছে, জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব-চেতনা এক হইয়া গিয়াছে, সে সূঁচের ছিদ্র দিয়াই চলিতে চলিতে একদিন অমৃত-সাগরের কূলে আসিয়া পৌঁছায়। দেহ এই সঙ্কীর্ণ পথে পিষিয়া স্থূলত্ব হারায়; মুক্তির ক্ষেত্রেও দেহ পৌঁছায় না, দিব্য দেহ লইতে হয়। শক্তির সঙ্কেতে যাত্রা তাই এত ভয়ঙ্কর! দেহ-চেতনার লয়,—সেও তো মৃত্যু—সাধের কাজল কয়জন লোক চক্ষে দেয়!

যাহার দীক্ষায় আছে সংশয়, চলিতে চলিতে যেমন মনে হওয়া—কল্পনা, অমনি যদি শূন্য দিয়া যাও, ধড়াস্ করিয়া পড়িতে

হইবে। জলের উপর ভাসিয়া চল, ডুবিতে হইবে। পায়ের তলা হইতে হাঁটা পথে মৃত্তিকা সরিয়া যাইবে, সম্বন্ধ-তত্ত্বে অবিচল নির্ভরতাই অপার্থিব করুণা রূপে "কোন পথ দিয়া কোথা লইয়া" গিয়া সহসা অমৃতের দুয়ারে পৌছাইয়া দিয়া যাইবে! যদি ঠিক ঠিক ধরা হয়, চলার পথে সংশয়ের মেঘ মনে আঁধার ঘনাইয়া না তুলে, তবে ভয় কি! মৃত্যুর করাল গ্রাসে হাসি মুখেই প্রবেশ কর; মৃত্যু যখন কাম্য নয়, তখন সহজভাবেই তোমায় সে ছাড়িয়া দিয়া যাইবে আরও কিছু দূর আগাইয়া দিয়া—সাধনার পথে এমন প্রত্যয় হয় কয় জনার বল দেখি?

শরীরে যদি ব্যাধি দেখা দেয়, অশান্তির আগুন যদি দশদিক্ ঘিরিয়া ধরে, সংগ্রাম করিও না ব্যাধির সঙ্গে, অশান্তি অমঙ্গলের সঙ্গে; এসব যখন দেহচেতনায় স্থান পাইয়াছে, স্বাস্থ্যের ও শান্তি-কল্যাণের কামনা বিসর্জ্জন দাও, সেখানে জাগাইয়া রাখ কেবল সম্বন্ধের আসক। তবেই সব গলিয়া যাইবে, কায়া হইবে সূক্ষ্ম—অনুর চেয়ে অনু। সব ঝাড়িয়া ফেল। যখন তত্ত্বের আশ্রয় এ আধার, তখন ইহা বিরাট্, মহৎ—তোমার পিছনেই পড়িয়া কাঁদে অন্ধকার, সম্মুখে যে জ্যোতিঃর সমুদ্র!

অনুসরণ কর—সম্বন্ধ। ধর্ম্ম তাহার লক্ষণ নয়, অলৌকিকতার আকর্ষণ নয়; বড় সহজ সে। সতীর পতি যদি হয় সামান্য ব্যক্তি, তবুও তার সে ইষ্ট। সম্বন্ধতত্ত্ব তোমার আসকের অভিষেকেই তোমাকে বৃহৎ করিয়া তোলে। সে যদি আসে ক্ষুদ্র অতিথির বেশে, তাকে বরণ করিয়া লইতেই তোমার যাত্রা। পথে যাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হয়, এই নব জন্মের

তোরণদ্বারে একা তো কেহই পৌছায় না—এ একটা জাতিরই অভিযান।

ফিরিয়া যাইবে তাহারা—যাহারা ব্রাহ্মণ; ফিরিয়া যাইবে গৃহী সন্ন্যাসী—যাহারা বর্ণ, ধর্ম্ম, আচার ছাড়িতে ভয় পায়, তাহারা এ গুরুভার মাথায় লইয়া চালুনীর ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া পার হইবে কি করিয়া? এখানে ব্রাহ্মণের উপবীতের মোট খসিয়া পড়ে, বৈশ্যত্ব শূদ্রত্বের বোঝা নামাইতে হয়। এ পথ দিয়া গলিয়া পার হওয়ার এই বিধি। আগাইয়া গেলে আর ফেরা যায় না। তাই সব সংস্কার পথে ছাড়িয়া ছাড়িয়া শেষে উলঙ্গ বেশেই এমন ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, যেখানে অতীতের বর্ণ, আশ্রম আর নাগাল পায় না। ইহারাই "সঙ্ঘধর্ম্মী", ইহারাই নবজাতির অগ্রদূত।

এ পথে যুক্তি নাই; বহির্ম্মুখী-চেতনা স্থূল দেহ, মন, বুদ্ধিতে জড়াইয়া আছে, সব গলিয়া যাক সম্বন্ধের রসায়নে। কেবল চল অনাহত গতিতে। বিচার রাখিও না। পথের দুপাশে সতর্ক করার বাঁধা বুলি উচ্চারিত হয়, কানে আঙ্গুল দিয়া চলিতে চলিতে এই অনিবার্য্য শক্তির আকর্ষণে দুর্গম পথে আগাইয়া চল। জীবন-চক্রে গ্রহ উপগ্রহের প্রভাব, লোক, সমাজ, আত্মীয়স্বজনের আনুকূল্য, সব অস্বীকার কর। হউক সব তোমার বিরুদ্ধ, পৃথিবীতে তোমার পথে আর কাহারও আশ্রয় যেন না থাকে। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হও। দেবগুরু বৃহস্পতি যদি একাদশে উদয় হইয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করে, উপেক্ষা কর, অস্বীকার কর। জীবন উলটিয়া পালটিয়া যাক। ঈশ্বরতত্ত্বের

যে পরম সম্বন্ধ—একমাত্র এই আশ্রয়, এই আনুকূল্য, গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত এখানে বীর্য্যহীন। কেবল এই চেতনাকে জাগাইয়া রাখ। ইষ্টের সঙ্গে যুক্তি ব্যতীত দৃষ্টিতে আর কিছু নাই। তোমার বিশ্রাম নাই, ছেদহীন গতি—উল্কার মত কেবল ছুটিয়া চলা। এই যে হাঁটিতে হাঁটিতে আজ সন্ন্যাসের রাজ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার বাহিরেও তোমায় দৌড়াইতে হইবে; সে সম্বন্ধের আকর্ষণ কোথাও স্থির হইতে দেয় না, টানিয়া লইয়া ছুটায়। প্রথম ছন্নছাড়া হইয়া বড় কদর্য্য মূর্ত্তি হয়—ভগবানের মানুষ তুমি, গতির ছন্দে নূতন করিয়া সবখানি যখন গড়িয়া উঠিবে, তখন দেখিবে—একটা বহুদূরবিস্তৃত রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া একটা নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ; সেখানে এখনও মানুষের পায়ের দাগ ধরিয়া মর্ত্ত্যের মলিনতা আসিয়া পৌঁছায় নাই। এই দিব্য রাজ্যের দিব্য মানুষ এখানে নূতন বর্ণ, নূতন আশ্রম গড়িয়া একটা নব রাজ্য নির্ম্মাণ করিবে, এই নূতন দেশের প্রজারা দেবজাতি বলিয়া একটা নবসৃষ্টির দুয়ার খুলিয়া দিবে।

*   *
*

দশম পরিচ্ছেদ

আমরা নির্ম্মাণ-যজ্ঞের ঋত্বিক্। ধ্বংসের বজ্র যেমন কেবল ধ্বংসের জন্যই নহে, উহার মধ্যে সৃষ্টি ও স্থিতির শক্তিও নিহিত থাকে; মরণের পরই যেমন জীবনের অঙ্কুর দেখা দেয়, অনন্ত প্রাণ-শক্তিকে লীলায়িত করিয়া তুলে—তদ্রূপ নির্ম্মাণের যজ্ঞেও ধ্বংস ও স্থিতি উভয়ই যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয়। ধ্বংস ও সৃষ্টি একই জীবনচ্ছন্দের দুটা দিক। স্ব স্ব প্রকৃতি ও আত্মধর্ম্মানুসারে কোথাও একদিক্, কোথাও বা তার বিপরীত দিক্ হইতে জীবনের কার্য্য আরব্ধ হয়। তত্ত্বদর্শী এই উভয় ধারাকেই শ্রদ্ধার সহিত সন্দর্শন করেন।

যুগের ডাকে ধ্বংসের রুদ্র-ভেরী বাজিয়াছে—অতএব এখন সৃষ্টির কথায় কাণ দিও না। অন্ধ যন্ত্র এমনই বিকৃত শব্দ করে। এ যেন সেই বৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশীর মত, সে ভুবনমাতান সুরের ঝঙ্কার কেবল তাদেরই কাণে পৌছিয়াছিল—যাহারা শ্যাম-সোহাগিনী। শিবের রুদ্র-বিষাণ অথবা কৃষ্ণচন্দ্রের মুরলী-ধ্বনি যুগপৎ শ্রবণ করার নিরপেক্ষ শ্রুতি বোধ হয় থাকিতে নাই; যে যাহার অনুরাগী সে তাহাই শুনে, উন্মাদ হয়। একই পাঞ্চজন্যে বিনাশ ও সৃজনের আহ্বান ফুকারিয়া উঠে, অথচ আমরা শুনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে; তাই কর্ম্মক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব কলহের অন্ত নাই।

এই অন্ধকার, অস্পষ্টতা, সংশয়, ক্রূরতা বিদীর্ণ করিয়াই যে যাহার জন্য চিহ্নিত, তাহাকে তাহার কল্প-নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ইহা তো সহজ নয়; আত্মস্থ যোগী ভিন্ন অন্তর্য্যামীর ইচ্ছানুবর্ত্তী জীবন-যন্ত্র তো চালান যায় না। এই কারণেই কেহ স্বধর্ম্ম পালন করে, অন্যে কেবল গুণলুব্ধ, মোহমুগ্ধ হইয়া তাহার অনুরণ করিয়াই জীবন শেষ করিয়া দেয়। কেহ বা পরধর্ম্মকে আত্মধর্ম্ম মনে করিয়াই মনকে গড়িয়া তুলে—বিপরীত আচরণেই ইহারা রস পায়, শক্তি অনুভব করে। এমনই বিচিত্র মায়া, জীবনের বিচিত্র ছলনা! ইহাও সেই "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্"-এর ন্যায় শ্রুতিপ্রমাণিত আমাদের এক অদ্ভূত অবস্থা-বিশেষ! আমরা বুঝিয়াও বুঝি না; দেখিয়াও দেখি না, শুনিলে অবাক্ হই—যাহা অভ্যাস, যাহা সংস্কার, তাহা হইতে অব্যাহতি পাই না।

প্রয়োজন নাই—বস্তু-লাভ হইবে কেন? গুরুবস্তু তাই সতত গৌরব-বর্জ্জিত হইয়াই পাশে পাশে অবস্থান করে। প্রয়োজন-বোধের উন্মেষে উহা মহিমামণ্ডিত হইয়া ধরা দেয়; অন্যথা যে দিক্ হইতে আকর্ষণ আসে, সেইদিকেই চক্ষু ছুটাইয়া দিই; কাণে যে দিক্ হইতে সম্মোহন-মন্ত্র আসিয়া মন কাড়িয়া লয়, সেইদিকেই চরণ ছুটিয়া চলে। সে কি ধর্ম্মে, কি অধর্ম্মে, কি বিদ্বেষের বশবর্ত্তিতায়, কি প্রেমের ছলনায়; আত্মধর্ম্ম-হারার পাপ পুণ্যের আকর্ষণ দুইই সমান; কেন না, ফল একই রূপ। জীবনের যে দ্যোতনা, রজস্তমোবর্জ্জিত যে জ্যোতির্ম্ময় অচ্ছিন্ন আনন্দধারা তাহা যখন জীবন অভিষিক্ত করে না, তখন মনের

হিসাবে পাপ পুণ্যের তারতম্য করিয়া, নিজেকে সত্যানুসারী করার প্রযত্ন তত্ত্ববিদ্ তুল্য চক্ষেই দেখিবে—ইহা তো কিছু বিচিত্র কথা নহে।

কিন্তু স্বধর্ম্ম পাওয়ার সনাতন পদ্ধতি আছে। আমরা ইহা দুঃসাধ্য অথবা সাধনসাপেক্ষ বলিয়া ক্রমে দূরে পরিহার করিতেছি। ভারতের স্বরূপোলব্ধির রাজবর্ত্ম আজ চলাচলহীন। মুক্তির মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিতে এই যে পরাঙ্মুখতা—ইহাই আমাদের মৃত্যুর কারণ। পল্লবগ্রাহী শিক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যে শ্রদ্ধার সাধনায় মানুষের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হয়, সেই শ্রদ্ধাবস্তু হইতে সাধনার অভাবেই আমরা বঞ্চিত হইতেছি। যাহার বিনিময়ে যে বস্তুর লাভ হয়, তাহা যদি হারাইয়া বসি, তবে অভীষ্ট হইতে কি বঞ্চিত হইব না? বিশ্বাস আজ অন্ধতার কারণ, ভক্তি-প্রীতি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, শ্রদ্ধা-আনুগত্য দাস-মনোবৃত্তি—ভূতের ভাষা আজ আমাদের রসনা কলঙ্কিত করে! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আত্ম-প্রত্যয় না থাকায় অদৃষ্ট ফলে যে যেমন সঙ্গ পাইয়াছে, সে তেমন ভাবেই গড়িয়া উঠে। সৎসঙ্গ বিরল; কাজেই বিরাট্ অন্ধকারই আমাদের ঘিরিয়া ধরে। কিন্তু মুক্তির আলো নিশ্চয় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—এই জন্যই তো একদল সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী চাই, যাহারা ব্যক্তিগত, সমাজগত, ধর্ম্মগত, কোন কুণ্ঠায় নীরব থাকিবে না, মৌন থাকিবে না, উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের চির-প্রসিদ্ধ সনাতনের কীর্ত্তন ঘোষণা করিবে।

দেখ, বিশ্বাস কখন অন্ধ নয়। সূর্য্যকে কি অন্ধকারের পিণ্ড বলিয়া অভিহিত করা যায়? উঁহা দর্শনযোগ্য বলিয়া অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু বিশ্বাস-বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলেও, উহার অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। চর্ম্ম-চক্ষেই যে সব দেখা যাইবে, এমন তো কোন কথা নাই। বিশ্বাস বলিয়া যে বস্তু আছে, তাহা মুদিত-চক্ষু নয়। উহা অগ্র্যুজ্জ্বল দীপ্তদৃষ্টি লইয়া আগাইয়া চলে, যাহা মিথ্যা তাহা বর্জ্জন করে। উহা সত্যকে এমন করিয়া বুকে আঁকড়াইয়া ধরে, যে সমগ্র পৃথিবী তাহার ধৃত-মুষ্টিতে আঘাত দিলেও সে ছাড়ে না; বরং ঝুঁকিয়া পড়ে ধরণীর বুকে—বিশ্বাসের রক্তবীজের সৃষ্টি হয়, যাহা জগজ্জয়ের সূচনা করে। অবিশ্বাসী, পল্লবগ্রাহী, বাক্‌সর্ব্বস্ব, আত্মহারা জাতি আজ ইহা হাসিয়া উড়ায়। আশ্চর্য্য, প্রতি পদে সত্যের জ্বলন্ত প্রমাণ স্বমহিমায় বিশ্ব ছাইয়া ফেলে; তবুও ইহারা চক্ষু বুজিয়া তাহা অস্বীকার করে। জানিও, ইহাই ইহাদের স্বভাব ও স্বধর্ম্ম। দেহ মৃত হইলে, মাংসাদি যেমন কীটে ছাইয়া ফেলে—জাতি পরাধীন হইলেও, তেমনি এই শ্রেণীর জীবই অধিক জন্মিয়া থাকে। আর ইহারা অঙ্গের উপরেই কিল্‌বিল্‌ করে; তাই বক্তৃতামঞ্চে, কর্ম্মক্ষেত্রে, দেবী ভারতীর মন্দিরে, ইহারাই ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিও, শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়া যে পূজারী অনন্যমনাঃ হইয়া হৃদয়ের পূজা দিতে আসে, ইহাদের প্ররোচনায় তাহাকে ফিরিতে হয়; অন্যথা হইলে এই সব অবিশ্বাসী ধর্ম্মান্ধ জীবনের সহিত সংঘর্ষে একটা বিপ্লব বাধিয়া যায়। স্বজন-দ্রোহ বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু

অবনত জাতির যথার্থ মুক্তির পথে ইহারাই ছদ্মবেশী আততায়ী। এই জন্যই দেশের বিরুদ্ধে দেশকে মাথা তুলিয়া উঠিতেই হয়। জয় পরাজয় বহু বিলম্বে স্থির হয়। বাহির হইতে সত্যনির্ণয় হয় না; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন—জয় কোন্ পক্ষে অবধারিত। "যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ"—ইহা লক্ষণ দ্বারাই বুঝা যায়।

দেশে তো আজ ধর্ম্ম-যুদ্ধের যুগ; তবুও মানুষের মনে এত পাপ কেন, কলুষ কেন—বলিতে পার? নির্য্যাতন সহিলেই যে সে স্বজাতি বৎসল হইবে, এমন মনে করিয়া ভ্রম করিও না। সাধুজনের পরিত্রাণবিধান স্বয়ং ভগবান করেন। হিসাবের অঙ্ক ভুল করিতে অধর্ম্মই অনেক সময়ে অত্যাচার ডাকিয়া আনে, নিজেকে অত্যাচারিত সপ্রমাণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়, আত্ম-কর্ম্মের বিস্তারই ইহার উদ্দেশ্য—বহুজনের উপর কর্ত্তৃত্ব, কাজেই বহুজনকে বহুদিন ভারতের সত্য, তপস্যা, অহিংসার সাধন হইতে বঞ্চিত রাখে। ইহাতে অভারতীয় স্বার্থই সিদ্ধ হয়। স্বজাতির বেশে ইহারা প্রত্যক্ষ শত্রুর অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট করে।

পাপের এই ষড়যন্ত্রে আমরা কখন বিমূঢ় হইব না, যদি আত্ম-ধর্ম্মকে আমরা সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিয়া চলিতে পারি। এই ধর্ম্ম আচারে নাই, অনুষ্ঠানে নাই; উহা তো ধর্ম্মের বহিরঙ্গ। ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম আমাদের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে। বরং আচার অনুষ্ঠান আশ্রয় করিয়া থাকা ভাল, তবুও অনাচারী হইয়া পাপের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমরা তবুও সেই ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধার আসন দিতে কুণ্ঠা করিব না, যে ব্রাহ্মণ সদাচারী; উপবীত-ধারী যেখানে অনাচার ডাকিয়া আনে অথচ ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা ছাড়ে না,—সে কপট ছলকে যেন সংশয়ের চক্ষে দেখিয়া আমরা সতর্ক হই। যে হিন্দু হিন্দুর আচার ছাড়ে নাই, তাহাকে আবার ফিরিয়া পাইবে; কিন্তু যে আচার ছাড়িয়াছে অথচ আচারের বাহিরে যে শাশ্বত ত্যাগ বৈরাগ্যের ঋজুদণ্ড তাহা আশ্রয় করে নাই, তাহাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না। মোল্লার কোপ হইতে যদিও মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়, হিন্দু যদি কালাপাহাড় হয়, তাহা হইলে সে ভীষণতর আততায়ী—এ কথা স্মরণ রাখিও।

ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। মুক্তি-যজ্ঞে ইহারা ঋত্বিকের আসন পাতিয়া বসে, পূর্ণাহুতির সময়ে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া যজ্ঞ পণ্ড করে। ধর্ম্মান্দোলনের ইহারা অগ্রপুরোহিত-বেশে পতাকা ধরিয়া চলে—সে কেবল যাত্রীদের বিপদে নিক্ষেপ করিয়া মজা দেখিবার জন্য। গাছে উঠাইয়া মই কাড়িয়া লওয়ার যে প্রবাদ শুনিতে পাও, এই শ্রেণীর জীবের দ্বারাই এইরূপ কর্ম্ম সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয়।

এই হেতু আজ আত্মস্থ, আত্মনিষ্ঠ ব্যষ্টি এবং সমষ্টি গঠন করার প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। যুগশঙ্খ বাজিয়াছে, দেশ মুক্তিপ্রবাহে ভাসিয়াছে, লক্ষ্যস্থানে ছুটিয়াছে—এ সবই সত্য; কিন্তু এই বিপুল কোলাহলপূর্ণ আহবের মাঝে জাতিকে চিনিয়া লইতে হইবে, পরস্পর আত্ম-পরিচয় দ্বারা উভয়ের মধ্যে

অভেদ-তত্ত্বের অনুভূতি লাভ করিতে হইবে। কবির কথায় বলিতে হয়—

"এক দেশ, এক জাতি,
এক ভগবান"

—এই মহাবাণী যাহাতে সার্থক হয়, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

হত্যা কর, বিনাশ কর, বিধ্বংস কর—এই যে বিকট চীৎকার, ইহার মধ্যে আবার দিগন্তপ্লাবী রবে একদল লোকের কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিবে—"এক হও, সংহতিবদ্ধ হও, সৃজনের সিদ্ধ উপকরণ হও।" হতকে অপসারিত কর, বিনষ্টকে বিশ্লেষণ কর, ধ্বংসকে অতিক্রম করিয়া দেখ, সৃজনের তৃণাঙ্কুর দেখা দিয়াছে; সে নবীন শ্যামশ্রী তোমার নয়ন শীতল করিবে, হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলিবে। ধ্বংসের বজ্রে এমনই অমৃত-ঝরণা অনাদিযুগ হইতে ঝরিয়া থাকে। আবার ঐক্যবদ্ধ হইতে গিয়া দেখ, ভেদ ও স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইতে অতীতকে কি নিষ্ঠুর ভাবেই তুমি হত্যা করিয়াছ; সংহতিবদ্ধ হইবার জন্য বিকর্ষণশক্তিকে কি নিদারুণ পদচাপে চূর্ণ করিয়াছ; সৃষ্টির সিদ্ধ-বীর্য্য হইবার আশায় হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে কি নির্ম্মম হইয়াই না ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ। সৃষ্টির জন্যই লয়, আবার লয়ের কোলেই সৃজনের কনক-মূর্ত্তি উমার নবজন্ম। এই স্থিতিটুকুই তো স্বভাব, জন্ম মরণের অধীন—অসাধারণ অনাগতকে যে টানিয়া আনে, অব্যক্তকে যে ব্যক্ত করিতে চায়, সেই অসাধারণ কর্ম্মী যে সৃষ্টিধরের অনাহত কর্ম্ম-শক্তিকে,

সৃজনশক্তিকে প্রবুদ্ধ সচেতন রাখে—ব্যক্তকে সতত অব্যক্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া। এই মহাকর্ম্মই তো জীবন, ইহাই তো ভাগবতধর্ম্ম—পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয় করিয়া, এক অদ্বৈতের লীলাবিলাস। যাহা কিছু অপরিণামী, তাহা আবার বর্দ্ধন-শীল—তিলে তিলে যেন তার মাধুর্য্য বাড়িয়া চলে। এই টানা-পোড়েন একই সূতার হইলেও, স্থিতকে সে এমনই করিয়া গড়িয়া তুলে, রক্ষা করে। তাই নির্ম্মাণের মন্ত্র যদি আজ ধ্বংসের কুরুক্ষেত্রে নবগীতা রচনা করে, তবে তাহা উপেক্ষা করিও না। ইহার অব্যর্থ প্রয়োজন অন্ধতা-প্রযুক্ত অস্বীকৃত হইলেও, এ উত্তাল জলতরঙ্গ রুদ্ধ হইবার নহে।

আমরা তাই বিশুদ্ধ নির্ম্মাণ-যজ্ঞের ঋত্বিকৃদের আহ্বান দিই—এস, তপঃক্ষেত্রে সমবেত হও; তোমার কণ্ঠে স্বধা, স্বাহা মন্ত্র গগন পবন বিদীর্ণ করিয়া আবার উচ্চারিত হোক। তোমাদের প্রভাতযজ্ঞের হোম-কুণ্ডে অগ্নি-শিখা প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠুক। এস—অতীত ঘরসংসার পদচাপে চূর্ণ করিয়া, পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের মোহ-বন্ধন টুটাইয়া; সংসার-কারা তোমাদের পদাঘাতে ঝন্ ঝন্ করিয়া খসিয়া পড়ুক। ঐ যাদের এক হাতে বজ্র, এক হাতে মরণ-শিঙ্গা, আর ধরণীর বুকে ছন্দোহীন চরণ প্রচণ্ড-তালে নৃত্য-তৎপর, উহাদের কণ্ঠে যে বেদের ছন্দ তাহা তোমাদের নহে; তোমরা বিরাট্ হিরণ্য-গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া মহাসংকর্ষণে টানিয়া আন অনাগতকে, ছড়াইয়া দাও বিশ্বের বুকে; রুদ্রের বজ্রে যাহা বিনষ্ট না হয়, তাহাই অক্ষয় হইয়া ধরায় অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে। আর

ঐ স্থিতিশীল সমাজ লোক-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম প্রভৃতি লইয়া বিব্রত, ঐ সতত কুণ্ঠিত, ক্ষুব্ধ-চিত্ত, মোহগ্রস্ত সৃষ্টি, উহারও ধর্ম্ম যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে। তোমরা লজ্জাহীন, ধৈর্য্যহীন, আত্মসুখ-দেহসুখ-ত্যাগী মহাযোগী। এস তোমরা যুগলে যুগলে বাহির হইয়া—ধরণী তোমাদের বরণ করিয়া লউক। নূতন সমাজ, নূতন ধর্ম্ম, নূতন বেদ, নব নব শিক্ষা-সাধনার শতধা ধারায় জগৎ ছাইয়া যাক্। তোমরা উদাসীন, অপার্থিব প্রেমের বিরাট্ আশ্রয়, অন্ধতম কামকে বাহন করিয়া প্রেমের নির্ম্মল ভাস্কর, নির্ম্মাণের বিধাতৃশক্তি। জাতিকে রূপ দাও, ঐশ্বর্য্য দাও; হে জাতির ভগবান, ষড়ৈশ্বর্য্যে এ জাতিকে ভরাট করিয়া তোল।

স্থিতির ধর্ম্ম—ভুক্তি ও মুক্তি। তোমরা ঈশ্বরকোটী, নিত্য-মুক্ত; তাই তোমাদের সাধন, তোমাদের ধর্ম্ম, তোমাদের যোগ যে অভিনব। তোমরা যদি পরধর্ম্মে আত্মহারা হও, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম-চ্যুত। এ জীবন যে বৃথায় শেষ হইবে। তোমাদের জন্য ঋষিরা যে ঋক্-রচনা হইয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিঃ

"তোমাদের সুদৃঢ় সংহতি, পরস্পর অপ্রতিকূল বাক্য, অপ্রতিকূল কার্য্যানুষ্ঠান সঙ্কল্পের সাম্য, ব্যক্তিগত ক্রোধ-লোভসংবরণ, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বর্জ্জন, ব্যক্তিগত প্রিয় বস্তুতে অনাসক্তি, উপেক্ষা, পরস্পরের প্রতি ঐকান্তিক সমবেদনা—ইহাই যে জীবনসাধনা, ইহা ব্যতীত অন্য কামনা আর রাখিবে না। এই বিশুদ্ধ অনুরাগের ক্ষেত্র আমার

পূত ভারত, আর এই জাতি সেই নূতন স্বর্গের দেবতা। ধর্ম্মক্ষেত্র-সৃজনের অঙ্গীকারপালনের জন্য যারা আত্মত্যাগী, নিজ দেহ-প্রীতিও অস্বীকার করিতে পারে, তাহারাই ইহার অধিকারী।

এই নির্ম্মাণ-চক্রই সঙ্ঘ। ভগবানের সিদ্ধযন্ত্রস্বরূপ ইহাদের উপরেই ভবিষ্য ভারতের সর্ব্ববিধ স্থায়ী মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে বর্ত্তমান লয় পাইবে, অনাগতকে আহ্বান দিয়া স্তরে স্তরে সঙ্ঘই নব সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তুলিবে।

এখানে ঐক্যই লক্ষ্য, সাধ্য প্রেম। ইহা ব্যতীত গুরু-বস্তু দ্বিতীয় নাই। এখানে গুরুর ধর্ম্ম সত্যই গৌরব-বর্জ্জিত; কেন না, তাহা সকলকে বিচিত্র সম্বন্ধের রসায়নেই এক করিয়াছে, অথচ এক অদ্বয় বস্তুকেই বিচিত্র রূপে রসে লীলায়ত করিয়াছে। এখানে শান্তির গরিমা নাই, সত্যের মহিমা নাই, পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা নাই; কেন না এগুলি তো সাধ্য নহে। অতৃপ্তিই এই ক্ষেত্রের আলো, সত্য মিথ্যার উপরে ইহার স্থিতি, পাণ্ডিত্য এ পথের অন্তরায়, পরিপাটী প্রেম, সেবা ও ইষ্টসমাহিত হইয়া যুগ যুগ অবস্থিতি ভিন্ন নিত্য সৃষ্টির আর দ্বিতীয় কৌশল নাই। এই সঙ্ঘ-তত্ত্ব—বৈষ্ণব কবির ভাষায়ঃ—

এ সব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ॥

—সঙ্ঘের চিহ্নিত নরনারী ভিন্ন অপরকে বুঝান সম্ভব নয়।

কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলন নহে। ইহা শ্রীভগবানের কায়ব্যূহরূপ অখণ্ড চিন্ময়। তাই বলিতে ভাষা যোগায় না, নূতন বেদের ঝঙ্কার কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলে—

আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

এখানে বিদ্যা প্রতিভা, সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য আকার-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্বপ্রকাশ হইলেও, অভেদ তত্ত্ব বলিয়া কাহারও গরিমা নাই। ইহা যে এক অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তুর বিচিত্র বিকাশ মাত্র।

বাংলায় সন্ন্যাসী মর্ম্ম নিঙড়াইয়া গাহিয়াছেন ঃ—

ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ দেহে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

ভারতের এই অপার্থিব তত্ত্ব জাতি-সম্প্রদায়-ভেদবর্জ্জিত; জীবনের সত্য কে উপেক্ষা করিবে? খণ্ডকে আদর্শ করিলেই বিরোধ, পূর্ণতার স্বরূপ যে লাভ করে, সে তো জগতের আদর্শ। ভারতের আদর্শবাদ গলদ-শূন্য, দ্বন্দ্বশূন্য করিতে হইবে—মানুষের সঙ্গে তর্ক কলহ করিয়া নহে; এই যথার্থ সনাতন ভারত-ধর্ম্মের বীজ বক্ষে লইয়া একদল সন্ন্যাসী, গৃহী, আচার্য্য, বৈজ্ঞানিককে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এখানে সন্ন্যাসীর চিদাকাশে ঈশ্বরের রূপই সন্ন্যাস; গৃহীও স্বয়ং ভগবান, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যই জ্ঞান বিজ্ঞানে মূর্ত্ত। এই যে অনুবাদ-তত্ত্ব ভারতের তাহা অপূর্ব্ব আবিষ্কার। নেতি'র ধর্ম্ম—সৎকে স্বরূপতঃ পাওয়ার জন্য; সে সৎ ব্যক্ত, অব্যক্ত, পুরুষ ও কাল রূপে নিত্য। তাই আদর্শ জীবন অর্থে মোক্ষ নহে। আদর্শ—যোগের সাহায্যে

আত্মদর্শন, জ্ঞানের সাহায্যে এই সৃষ্টির পরিধি-নির্ণয়, সর্ব্বময় ব্রহ্মানুভূতি ; তারপর সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভাগবত তত্ত্বে প্রপঞ্চ দেহচেতনার সম্পূর্ণ রূপান্তর। সে আকার সন্ন্যাসী অথবা গৃহী, যে রূপেই ফুটিয়া উঠুক। ভারতের ভবিষ্য জাতীয়তা ইহা কি সপ্রমাণ করিবে না—

"কোটী অংশ, কোটী শক্তি, কোটী অবতার"

তাই আজ জয়কামনায় ভারতের অন্তর্য্যামী জাগিয়া উঠিয়াছেন। কর্ম্মযন্ত্রের মধ্যে সব জ্ঞান বিধৃত না হউক, যে তৃতীয় পুরুষের হস্তে ভারতের প্রাণ-শক্তি আজ পরিচালিত, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ; এই জ্ঞান-রশ্মি নব চেতনায় জাতির প্রাণ যত পূর্ণ করিবে, ততই ভারতের জাতীয়তা নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মাটীর উপরই সর্ব্বাগ্রে জন্মগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এবং এই অপার্থিব চেতনার স্পন্দন ও প্রবাহ ধরিয়াই অসংখ্য কোটী মানবের মধ্যে ভারত-জাতি জন্মলাভ করিবে। ইহারাই সনাতনধর্ম্মী। গৃহী সন্ন্যাসীর রূপ-ভেদে যেমন বৈষম্য-বোধের কারণ নাই, তদ্রূপ জগজ্জাতিকে উপায়ভেদে ভারতই একত্র করিবে। তাই আজ তাহার প্রয়োজন অখণ্ড জাতীয় শক্তি, এবং ইহার প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র—স্বাধীন জন্মভূমি। কতখানি গোড়ার গলদ ঘুচিলে তবে আমরা মুক্তি পাইব, তরুণকে একবার চিন্তা করিতে বলি।

* * *

'প্রবর্ত্তক'-সম্পাদক শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী

যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

নবভারতের প্রাণদাতা নরেন্দ্রনাথ' কেমন করিয়া বিবেকানন্দে পরিণত হইলেন—সেই যুগ-সাধনার কেন্দ্রচক্র 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ' কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল, তাহারই জলন্ত ইতিহাস মতিবাবুর অগ্নিময়ী লেখনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রায় ৫০ খানি চিত্রে সুশোভিত, উপহার উপযোগী পুস্তক। ২য় সংস্করণ—মূল্য ১৷৷০ টাকা।

আত্মশক্তি—"......বাস্তবিক অল্প কথায় স্বামীজীর জীবন-কথা ও ধর্ম্মমত এমন সুন্দরভাবে আমরা আর কোথাও পড়ি নাই।"

উদ্বোধন—"গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার ভাষায় বিশেষত্ব আছে, মাধুর্য্য আছে, মাদকতা আছে। গ্রন্থকার নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষায় অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ত্যাগ ও তপস্যার জলন্ত আদর্শ ভিত্তি করিয়া পবিত্র দাম্পত্য জীবনের যে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার গভীর নিগূঢ় মর্ম্ম, অমৃতময়ী শিক্ষা সাধনার দৃষ্টি দিয়া নিপুণভাবে উদ্‌ঘাটিত ও আলোচিত হইয়াছে—ভবিষ্য-সমাজসৃষ্টির ইহা সিদ্ধ সঙ্কেত। বহুচিত্রে সুশোভিত, ১৫০ পৃষ্ঠার বই, দাম ১৷০ আনা মাত্র।

আনন্দবাজার পত্রিকা—"শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীর দাম্পত্যজীবন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর স্থাপিত। এই কামগন্ধহীন শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেমময় দাম্পত্যজীবনের উচ্চভাব সকলে ধারণা করিতে পারে না। মতিবাবু তাহা সরল ভাষায় সহজবোধ্য করিয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থ সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।"

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শিবানন্দ—"......পুস্তকখানি আমি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম, উহা আমি পাঠও করিয়াছি। আমার বেশ ভালই লাগিয়াছে।"

স্বদেশীযুগের স্মৃতি

এ জাতির প্রাণ-জাগার সেই অমর-কাহিনী—স্বদেশীযুগের মন্দাকিনী প্রবাহ বাংলার বুকেই ঢল দিয়া প্রথম নামিয়াছিল—সারা ভারত আজ সেই পুণ্যভাবস্রোতে স্নাত ও অভিষিক্ত হইয়াই মুক্তি তীর্থে ছুটিয়াছে। যে নবভাবে এ মহাজাতির অভ্যুত্থান, তাহা নানা ঘটনা পরম্পরায় বহু কারণ সংযোগে সংগঠিত হইয়াছে; সেইগুলি তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে, ঐতিহাসিক ও স্বদেশপ্রেমিকের মমতাপূর্ণ স্বচ্ছ মনীষার আলোকে মনস্বী লেখক ফটোর মত তুলিয়া ধরিয়াছেন। মতিবাবুর বিবৃত কাহিনী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত, কল্পনা বা অনুমানমূলক নহে, কাজেই ইহা একাধারে ইতিহাসের কঠোর বাস্তব সত্য, কিন্তু লিপিচাতুর্য্যে উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর, হৃদয়গ্রাহী ও সুপাঠ্য। তরুণ বাংলা এই সুলিখিত জাগরণ-ইতিহাস—বাঙ্গালীজাতির জীবন-প্রভাতের মর্ম্মকথা পাঠ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হউন। বহুচিত্রে সুশোভিত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

আত্মসমর্পণ যোগ

দীক্ষা, সাধনার প্রণালী, শুদ্ধি ও দেবজীবন লাভের উদ্দেশ্যে যাহা যাহা জানিবার প্রয়োজন, তরুণ সাধকের উপযোগী সরল প্রাঞ্জলভাষায় মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তাহাই বুঝান হইয়াছে। দাম ১৲ টাকা।

যৌগিক সাধন

এই বইখানিতে মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়গুলির কথা, তাহাদের কার্য্যাদির বিবরণ খুব সরলভাবে বুঝান হইয়াছে। এখানি শ্রীঅরবিন্দের **Yogic sadhan**'এর অনুবাদ। মূল্য ৷৷৵০ আনা।

লীলা

অনন্ত যুগ ধরিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার যে অনন্ত নাট্যলীলা প্রকটিত করিয়া আসিতেছেন, সেই রহস্য উপলব্ধিপূর্ব্বক সকলেই যাহাতে ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারে, এই ভাবে ইহা লিখিত। মূল্য ৷৵০ আনা।

ভারতীর মন্দির (গল্পের বই)

• আজকাল জাতির ভাব, চিন্তা, আদর্শ ও জীবন লইয়া যে চতুর্দ্দিকে একটা সাড়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতরে একটি সৃজনেরই আভাস পাওয়া যায়। "ভারতীর মন্দিরে" সেই সৃজনেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সাহিত্যের তুলিকায় আঁকিয়া ধরা হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ছাপা, কাপড়ে বাঁধাই, উপহার উপযোগী পুস্তক ; মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

বঙ্গবাণী :—"......পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইহা গল্প নয়, যেন প্রত্যেকটী ঘটনার পশ্চাতে এক একটী সত্য কাহিনী মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ; সাধারণ গল্পের তরলতা নাই, অথচ অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্যের অভিনয়ও নাই।......"

Liberty :—"......The stories are replete with moral and economic problems, and a vein of constructive idealism runs through them all."

A. B. Patrika :—"......The book is delightful reading, refreshing and deeply suggestive. It ushers a new aspect of constructive production in Bengali Literature"

Advance :—"......The elegant style of the author and the richness of expressions with a delicate touch here and there have but a special charm to the book......."

অরবিন্দ মন্দিরে

অরবিন্দবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, বইখানিতে সেইগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। যোগ, সঙ্ঘ ও সাধন সম্বন্ধীয় অনেক কথা এই পুস্তকে আছে। মূল্য ॥৶০ দশ আনা।

নারী মঙ্গল

নারীসমস্যা সম্বন্ধে নূতন দিক্ দিয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী ও জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ তরুণ দেশসাধক ও সাধিকাগণ ইহার মধ্যে দিব্যজীবন ও নবসমাজ সাধনারই ইঙ্গিত পাইবেন। মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

সাধনা

যে সাধনায় দেশকর্ম্মীর চরিত্র গড়িবে, ভগবানের নির্দ্দেশ বুঝিয়া লীলার পথে চলিবার ভাব ও কৌশল আয়ত্ত হইবে, তাহাই এই বইখানিতে স্পষ্টাক্ষরে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ দশ আনা।

উদ্বোধন (স্ত্রীচরিত্রবিহীন নাটক)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব হিন্দু-জাগরণের সূক্ষ্ম ভাব-চিত্র। প্রাণহীন সংস্কার আন্দোলন ছাড়িয়া নূতন মন্ত্রে বাঙ্গালীর প্রাণ কিরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই সুন্দর অপূর্ব্ব আলেখ্য। ছাত্রদের অভিনয়োপযোগী। মূল্য ১৲ এক টাকা।

পতিব্রতা (তৃতীয়াঙ্ক নাটক)

সতীর গৌরব চিত্র—নাট্যকলার চূড়ান্ত পরিচয় লইয়া ফুটিয়াছে। সতীধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী। বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা।

চণ্ডীদাস (পঞ্চমাঙ্ক নাটক)

প্রেমের মর্ম্মকথা মহাগুরু চণ্ডীদাস আত্ম-বলিদান দিয়া যাহা গাহিয়াছেন, বাঙ্গালীকে আজ সেই জাতীয় সম্পদ্, জাতীয় সাহিত্যে নূতন ভাষা, কলা ও ছন্দের সৃষ্টি করিয়া আয়ত্ত করিবার দিন আসিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, ২৫০ পৃষ্ঠার বই। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

হিতবাদী—"চণ্ডীদাস প্রেমের কবি।......বাঙ্গালীর হৃদয়ক্ষেত্রে চণ্ডীদাসই সেই প্রেমের বীজ রোপন করিয়াছিলেন। জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজবিধান দেশাচার প্রভৃতির উপরেও যে প্রেমের সিংহাসন স্থাপিত, তাহা চণ্ডীদাস স্বয়ং অনুভব করিয়াছিলেন, সকলকে তাহা বুঝাইবার জন্য স্বয়ং দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে 'সহজিয়া' নামে যে প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মমত আছে, তাঁহার মূলতত্ত্ব এই নাটকে নিহিত আছে।"

প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস,
৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।